কাহারও চাকুরী করিতেন না, কায়স্থ এবং করণেরা সমুদায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার এই উভয় জাতিই মসীজীবী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজপ্রসাদে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের অন্নদাতা এবং আশীর্ব্বাদগৃহীতা হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোত্তর এবং যজন যাজন কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কায়স্থদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া অনেকে যেমন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, উড়িষ্যায় সেরূপ দৃষ্টান্ত নাই। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের অবস্থার কথা বারান্তরে বলিব। এবারে আনুসঙ্গিক ভাবে এই কথাটি বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম যে সম্পত্তিশালী বলিয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পরে করণ জাতিই উড়িষ্যায় পদস্থ ও গণ্যমান্য।

যাহারা পদস্থ, তাহারা সকলেরই অনুকরণের স্থল; ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতি অজ্ঞাতভাবে তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির বিশেষরূপে অনুকরণ করিয়াছে। সুতরাং করণ জাতির সামাজিক রীতি নীতির পরিচয় দিলে প্রায় সমগ্র উৎকলের সামাজিক অবস্থার ছবি চিত্রিত করা হয়। অতএব আশা করি এ সকল কথা জানিতে বাঙ্গালার পাঠিকাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ করণদিগের বিবাহ প্রথার কথা বলিব। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে বাল্যবিবাহ অথবা বালিকা কন্যাদান প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে এই প্রথা স্বীয় সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার করণদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। ক্ষত্রিয়দিগের মত বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে করণকুমারী বিবাহিতা হইতে পারেন না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের নিম্নে কোন করণ বালিকা বিবাহিতা হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও এদেশের ব্রাহ্মণ এবং অন্য কোন কোন জাতির মধ্যে শিশুবিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে কোন বর্ণের কন্যারাই স্বামিগৃহে যাইতে অথবা স্বামি সন্দর্শন লাভ করিতে পারেন না। এসকল নিয়ম সম্বন্ধে বাঙ্গালার মত উচ্ছৃঙ্খল দেশ আর দেখি নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে যত আপত্তি, উড়িষ্যায় তাহার অর্দ্ধেকও দেখিতে পাই না। শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ দেখিলে প্রতীত হইবে যে লোক সংখ্যার হিসাবে উড়িষ্যায় যত বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালায় তাহার অর্দ্ধেকও নহে।

আবার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা করণদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা একটু অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মার্জ্জিত রুচি নয় বলিয়া করণ বালিকাগণ অতিশয় কদর্য্য অশ্লীল প্রাচীন কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে শিক্ষা করে। এই শ্রেণীর গান যে বালিকার যত অভ্যস্ত, সমাজে তাহার তত প্রতিষ্ঠা। এই প্রকার বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত ইহারা অনেকে অবিবাহিতা অবস্থায় চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকে। এস্থলেও রুচির দোষে ইহাদিগের দ্বারা যে সকল ছবি চিত্রিত হয়, তাহা সময়ে সময়ে অতীব ঘৃণাজনক। অভিভাবকদিগের রুচি মার্জ্জিত হইলে অভ্যস্ত বিদ্যা সুফলপ্রসবিনী হইতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে করণ বালিকাদিগের আর একটি কৌতুকজনক শিক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। বিবাহের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বালিকাদিগকে কতকগুলি পয়ার মুখস্থ করাণ হয়; এই সকল পয়ারে বালিকা কিরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুর গৃহে যাইতেছে, তাহা বর্ণিত থাকে। চোখে জল আসুক আর নাই আসুক, কান্নার সুরে সেই পয়ারগুলি আবৃত্তি করিয়া বালিকাকে স্বামিগৃহে যাইবার পূর্ব্বে স্বগৃহে এবং প্রতিবাসীদিগের গৃহে প্রতি জনের নিকটে বিদায় লইতে হয়। কান্না কখনও এত হাস্যপ্রদ এবং অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় যে অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। কেবল এই কান্নার বিষয়েই নহে; আরও অনেক সামাজিক ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, করণ সমাজ অনেক নিয়মের কারাগারে পড়িয়া বড় অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিতেছে।

তৃতীয়তঃ সামাজিক সৌজন্য ও মেলামেশা। বাঙ্গালার তুলনায় উড়িষ্যায় সামাজিক সৌজন্য ও মেলামেশা বড় কম। উড়িষ্যায় আসিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ যাত্রীদিগের মুখে অবগত হইয়াছিলাম যে, অতিথি সৎকার করিবার প্রথা উড়িষ্যায় আদৌ নাই; এমন কি, একজন লোক কাহারও বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে, বসিবার জন্য একখানা জীর্ণ মাদুরও দেয় না। যখন একথা শুনিয়াছিলাম, তখন কলিকাতার কেবল উড়িয়া বেহারা দেখিয়া বিশ্বাস ছিল, যে উৎকল বাহকপরিপ্লুত, সুতরাং এরূপ অবস্থা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু এখন যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে উৎকলের অবস্থা সেরূপ হীন নহে, তখন জাতীয় সৌজন্য ও সামাজিকতার কিছু অভাব আছে বলিয়াই বোধ হয়। পল্লীগ্রামে যেরূপ প্রণালীতে গৃহস্থেরা গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে কোন অপরিচিত অতিথি যে কাহারও গৃহে আশ্রয় পাইবে সে সুবিধাই থাকে না। উড়িষ্যায় উপহার দিবার অর্থ, ব্যবসা করিয়া কিছু লাভ করা। কেহ যদি কাহারও

বাড়ীতে কিছু মিষ্টান্ন, ফলমূল বা অন্য কিছু উপহার পাঠাইল, তবে এই বুঝিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি তৎবিনিময়ে কিছু অর্থের প্রার্থী। বিক্রয় করিলে যাহা পাওয়া যায়, উপঢৌকন দিলে তদপেক্ষা কিছু বেশী মিলে। কেহ মনে করিবেন না যে এ কথাটা কেবল সাধারণ লোকের পক্ষেই প্রযুজ্য, বড় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা। কাহারও বিবাহ উপলক্ষে একজন কাহাকে দশটি টাকা কিম্বা কাপড় পাঠাইলেন। তৎবিনিময়ে তাঁহাকে বিংশ মুদ্রা বা দ্বিগুণ মূল্যের আর একখানি কাপড় ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। এই ভীষণ বিনিময় সামাজিকতার ভয়ে, মধ্য অবস্থার লোকেরা কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বড়লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে না।

বেশভূষা। উড়িয়ার বিশেষতঃ করণ জাতির বেশভূষার বর্ণনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়, বারান্তরে সে বিষয়ের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

উপসংহারে একটি অবান্তর কথা লিখিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে অনেকের সংস্কার আছে যে, উড়িষ্যায় বিধবা ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রথা অতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেই কখন কখন দৃষ্ট হয় এইমাত্র। যে জাতির মধ্যে এপ্রথা প্রচলিত, তাহারা মূলতঃ অনার্য্য জাতি। ইহাদিগের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল যে দেবর ভ্রাতৃবধূ বিবাহ করিবেন, এরূপ একটি বিশেষ-বাঁধা নিয়ম নাই। তবে উপযুক্ত দেবর থাকিতে বিধবার পক্ষে অন্য বিবাহ অপেক্ষা দেবর বিবাহই প্রশস্ত। কিন্তু পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্য উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির মধ্যে এ প্রথার লেশ মাত্রও নাই।

বিমাতা।

আমরা উপন্যাসে, প্রবচনে ও পুরাণে যে সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার স্নেহের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা সময় সময় আমাদের প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। অতি পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে পুরুষদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত, এখনও উহা নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়ে নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে রাজাদিগের মধ্যে এই বহুবিবাহ খুব গৌরবের বিষয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ বহু পুত্র লাভ, দ্বিতীয় কারণ রাজাদিগের বিলাসিতা। যাহা হউক এই বহু বিবাহে বহু সন্তান উৎপত্তি হইলেও পুরুষের পক্ষপাতিত্ব ও স্ত্রৈণতা দোষে সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। কারণ যদি কোন রাজার দশটি মহিষী থাকে, তাহার মধ্যে

এক জনের প্রতি অধিক অনুরাগ সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বেষানল উৎপাদন করে, কিম্বা ঐ সপত্নীগণের মধ্যে একজন বন্ধ্যা, অপরা পুত্রবতী হইলে কলহের সূত্রপাত হয়, অথবা রাজা প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভজ পুত্রকে রাজ্য দিয়া প্রকৃত রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমারকে তাঁহার স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সেই কুমারের ও তাহার মাতার মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করেন। এই বিদ্বেষাগুণ অল্পে প্রশমিত হয় না, ইহা রাজ্য, সাম্রাজ্য, ধন প্রাণ পর্য্যন্ত ছারখার করে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বিমাতাকে রাক্ষসী অথবা নিষ্ঠুরা বলিতে পারি না। যদি সপত্নী-পুত্রের উপর বিমাতার বিদ্বেষ থাকে, তবে তাহার কারণ ঐ সপত্নী-তনয়ের পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা। বাস্তবিক রমণী-হৃদয় শিশু সন্তানের উপর বিরূপ হয় না, ভগবান রামচন্দ্রের অভিষেক সংবাদে কৈকেয়ী আহ্লাদে কণ্ঠহার মন্থরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডের বিমাতা চণ্ডকে বিবাসিত করিয়া বিপদের সময় চণ্ডের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী সপত্নী-তনয় সহদেবকে গর্ভজ পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন; তদ্ভিন্ন সপত্নীর অবর্ত্তমানে তৎপুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতীব কোমল, ইহা সামান্য কারণে ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হয়, আবার সামান্য ঘটনায় নবনীতের ন্যায় গলিয়া যায়। যদি কোন শিশু সন্তানের ভার একটী নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীর হাতেও ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী হৃদয় ভাণ্ডারের সঞ্চিত অপত্য-স্নেহ ঐ শিশুকে না দিয়া থাকিতে পারে না, বিমাতা ত পিতার স্ত্রী। পিতৃমাতৃহীন সপত্নীপুত্রের ম্লান মুখ দেখিলে যাঁহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার না হয়, আমরা তাঁহাকে রাক্ষসী অপেক্ষাও ঘৃণিত নামে অভিহিতা করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা আজ একটী বিদ্বেষভাবাপন্না ক্রোধনস্বভাবা বিমাতার অসামান্য স্নেহে বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

হারকুলভূষণ বুধসিংহ সম্রাট্ আরঙ্গ-জীবের সময় বুন্দির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি তৎকালে রাজস্থানের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও রণকুশল নৃপতি ছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে শা আলম প্রতি-যোগী ভ্রাতৃগণের উপর জয়লাভ করিয়া দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুধসিংহের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অম্বর রাজকুমারী সম্রাটের সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বুধ সিংহ তাঁহার অন্যান্য মহিষীগণ অপেক্ষা অম্বর রাজকুমারীকে সমধিক যত্ন ও সম্মাননা করিতেন। এই কুশা-বহ কুমারী বন্ধ্যা, বুধসিংহের অন্য মহিষী বৈগু-রাজকুমারীর গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া কুশাবহ কুমারী ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটী ঘৃণিত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘৃণিত উপায়—তিনি নিজকে গর্ভবতী বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং যথাসময়ে একটী পুত্র সন্তান সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরে বুধসিংহ নিজ সুহৃদ ও বন্ধু জয়সিংহের সহিত মোগল শিবির হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াই কুশাসহ কুমারীর দুরাচরণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহকে বলিলেন। জয়সিংহ লজ্জিত হইয়া সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! তোমার সম্বন্ধে একি শুনিতে পাইতেছি?" অম্বরাধিপের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র বুন্দিরাজ মহিষী একেবারে ক্রোধোন্মত্তা হইয়া কপালমালিনী উগ্রচণ্ডার ন্যায় স্বীয় ভ্রাতার কটি হইতে তাড়িত বেগে অসি উন্মোচন পূর্ব্বক "কর্জ্জিকা বাচ্ছা" বলিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। অম্বররাজ যদিও রাজপুত বীর, মোগল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি এবং শত শত যুদ্ধে সহস্র সহস্র কামানের বজ্রনাদকে তুচ্ছ করিয়া কত শত বীর-কেশরীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, কিন্তু নিজ ভগ্নীর সর্ব্বসংহারিকা মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ইহাতেও অম্বর-রাজকুমারীর ক্রোধের শান্তি হইল না, তিনি প্রাণাধিক পরমারাধ্য পতিকে স্বহস্তে বিনাশ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বুধ সিংহকে কিছু না বলিয়া তৎসাক্ষাতে বুন্দি ত্যাগপূর্ব্বক বিনোদীর নগরের এক দেবালয়ে সন্ন্যাসিনী ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইনি ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলেন।

এদিকে অম্বরাধিপ ভগ্নীর নিকট অবমানিত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বুধসিংহের সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি বুন্দির প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে প্রলোভন দ্বারা বুধসিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ক্রূরমতি অম্বররাজ বুন্দিরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং করবার সর্দ্দার দলিলসিংহকে বুন্দির সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। বুধসিংহ বীর, কিন্তু তিনি জয়সিংহের শঠতাজালে আবদ্ধ হইয়া বীরোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কি করিবেন তাঁহার সহিত কতিপয় হারবীর মাত্র, সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার গণ শত্রুর চক্রে প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজলক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়াছে, পশ্চাতে অম্বররাজের বিশাল সেনাব্যূহ তাঁহাকে তাড়না করিতেছে। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার অন্তত ম

শ্বশুর বৈণ্ডরাজের নিকট পুত্র দুইটীকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তথায় দুঃখে অপমানে নিরাশার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ক্রূরমতি জয়সিংহের ইহাতেও ভস্মীকৃত অপমানের প্রতিশোধ পিপাসার তৃপ্তিবিধান হইল না। মিবারাধিপ রাণাকে অনুরোধ করিয়া বৈণ্ডজনপদ বুধসিংহের শিশু তনয়দ্বয়ের মাতামহের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। বৈণ্ড তখন মিবারের অধীন, কাজেই বৈণ্ডপতি রাণাকর্ত্তৃক স্বস্থানচ্যুত হইলেন; এদিকে বুধসিংহের জনৈক বিশ্বস্ত সর্দ্দার শিশুতনয় দুটীকে লইয়া পুচাইলের গিরিগুহায় বিজন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কালের কি বিচিত্র গতি!! মানব! অনিত্য সংসারে সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য! যে বুধসিংহের বাহুবলে একদা ভারত সিংহাসন নিরাপদ হইয়াছিল, যিনি রাজস্থান মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন, তিনিই সময়ে প্রতিকূল স্রোতে ভাসিয়া বিদেশে নিতান্ত দীনের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার বংশধর সুকুমার উম্মেদ সিংহ ও দীপ-সিংহ কোথায় সুখের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া প্রতিপালিত হইবেন, তাহা না হইয়া আজ তাঁহারা মনুষ্যের আবাস স্থলেও একটু স্থান পাইলেন না—আজ তাঁহারা রাজপুত্র হইয়া সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির বিচরণ স্থলে আশ্রয় লইয়া বন্য পশুর ন্যায় শত্রুপীড়নে বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। যখন বুধসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হারকুল গৌরব উম্মেদ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, তখন তিনি নির্জ্জন গিরিনিলয়ে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার পিতার ভীষণ শত্রু ও তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতকারী অম্বরাধিপ জয়সিংহ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরী সিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন, আর তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা মধুসিংহ স্বীয় মাতুল মিবারপতি রাণার উত্তেজনায় ও কতিপয় সর্দ্দারের উৎসাহে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। জয়সিংহ যদিও সুচতুর ও রাজনীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন, তত্রাপি তিনি যে সাপত্ন্য দ্বেষ ছিদ্র পাইয়া বুন্দি রাজ্যের উপযুক্ত রাজা বুধসিংহকে ছারেখারে দিলেন, সেই সাপত্ন্য দ্বেষানল যে তাঁহার নিজ গৃহে প্রজ্বলিত হইবে, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার বুঝিবার কথা, কারণ রাণা প্রতাপ সিংহের পর হইতে শিশোদীয় কুলের কন্যা যখন অন্য রাজপুতের হস্তে অর্পিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে একটী সত্যবন্ধন হইত, তাহা এই—"শিশোদীয় কুলের কন্যার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে সে অন্যান্য মহিষীগর্ভজ পুত্রের কনিষ্ঠ হইলেও রাজ্য প্রাপ্ত হইবে আর কন্যা সন্তান

হইলে তাহাকে কখনই মোগলের করে অর্পণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এস্থলে মধুসিংহ কনিষ্ঠ হইলেও শিশোদীয় কুলের দৌহিত্র, অপর দিকে ঈশ্বরী সিংহ জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাহাঁর জ্যেষ্ঠ স্বত্ব। এ অবস্থায় জয়সিংহ যে তাহাঁর রাজ্যের শান্তির উপায় আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে করেন নাই ইহা তাহাঁর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ রাজার কম ভ্রমের কথা নয়। বীর বালক উমেদ অম্বররাজের এই গৃহছিদ্রের সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। উমেদের সহায় ও অর্থবল কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ তিনি বুন্দি রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সেনাবল সংগ্রহ করিতে পারিলেও অম্বরের বিশাল অনীকিনীর নিকট সামান্য। কিন্তু উমেদ বুধসিংহের উপযুক্ত পুত্র—চৌহান কুলগৌরব পৃথ্বীর উপযুক্ত বংশধর। বীর বালক উমেদ সেই নির্জ্জন গিরি কাননে হারকুলের বিশাল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্তদিগকে একত্র করিয়া ক্রমান্বয়ে হৃদ দুর্গ সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন। বীর বালকের জ্বলন্ত উৎসাহে চারিদিক হইতে বুন্দি সর্দ্দারগণ তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। উমেদের অল্প সংখ্যক সৈন্যগণের নিকট অম্বরের সুশিক্ষিত বিশাল সৈন্যদল কতবার পরাজিত ও নিগৃহীত হইতে লাগিল—এমন কি এই বীর বালকের নিষ্কোষিত অসিদলে কত সুদক্ষ যুনানী গোলন্দাজ প্রাণ হারাইতে লাগিলেন—তাঁহার ভীষণ শূলদণ্ডে কত অম্বর সেনানীর মস্তক খণ্ডিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিশোধ-পিপাসা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি ভগবতী আশাপূর্ণার সম্মুখে শপথ করিলেন যে "মাতঃ! তোমার আশীর্ব্বাদে হয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিব, নয় স্বশোণিতে তোমার খর্পর পূর্ণ করিব।" কিন্তু তাঁহার সহায় বল অম্বর সৈন্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও হয়—বিশাল অম্বর সৈন্য সমুদ্রের নিকট তাঁহার সৈন্যদল গোষ্পদের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যতই যুদ্ধজয় করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সেনাবল ক্ষয় হইতে লাগিল—এমন কি তিনি দলযুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লুণ্ঠন কার্য্যে বাধ্য হইলেন। একদা লুণ্ঠন ব্যাপারে বহির্গত হইয়া উমেদ স্বদলে বিনোদীয় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত নগরে হারকুলের সর্ব্বনাশের মূলীভূতা তাঁহার বিমাতা অম্বররাজকুমারী বাস করিতেছিলেন শুনিয়া তিনি বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজ্যচ্যুত সপত্নী তনয়কে দেখিয়া রাজ্ঞীর অনুতাপানল দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে যে বীর বালক উমেদ রাজ্যভ্রষ্ট ও নির্ব্বাসিত, এই চিন্তা সহস্র সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় দংশন করিতে লাগিল এবং নিজ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া

তিনি ক্রোধে অধীরা হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রতিশোধের বিষয় মুহূর্ত্তে মধ্যে মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। কচ্ছাবহ কুমারী এখন আর উমেদের ঈর্ষাপরায়ণা বিমাতা রহিলেন না, এখন তিনি উমেদের কুশলাকাঙ্ক্ষিণী স্নেহময়ী জননী, বাঁধ ভাঙ্গিয়া এখন তাঁহার স্নেহস্রোত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি একেবারে উমেদকে ক্রোড়ে লইয়া সজলনেত্রে বলিলেন "বৎস! এই হতভাগিনীই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আমাহইতেই তুমি দীন দশায় পতিত হইয়াছ। বাছা! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমার আর কষ্ট পাইতে হইবেক না, তোমার যে বিমাতা হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, তাহা হইতেই তুমি পুনঃ বুন্দি সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তুমি এখন আর আমার সপত্নীতনয় নও, এখন তুমি আমার হৃদয়ের ধন, স্নেহের ভাণ্ডার, বুন্দিরাজ উমেদ।"

বুন্দিমহিষী আর এখন দেবালয়ের সন্ন্যাসিনী রহিলেন না। তিনি এখন আবার সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পুত্রের রাজ্যোদ্ধারে যত্নবতী হইলেন। এখন তিনি উমেদকে উপস্থিত মত পরামর্শ দিয়া যথাসাধ্য সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ হারসৈন্য সঙ্গে লইয়া একেবারে দক্ষিণ দেশাভিমুখে গমন করিলেন; স্বল্প দিনে তিনি নর্ম্মদা তীরে উপনীত হইয়া পরপারে যাইতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি স্মারক স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "মহিষি! আপনাদের নর্ম্মদা পার হইতে নিষেধ আছে, এই দেখুন এই স্তম্ভ সমস্ত রাজপুতের আটক হইয়া রহিয়াছে।" ইহা শুনিবামাত্র বুধ সিংহের বিধবা মহিষী প্রকৃত রাজপুত-নারীর ন্যায় সেই স্তম্ভস্থ শিলা শাসনখানিকে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া নর্ম্মদা জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সত্বর নর্ম্মদা পার হইয়া একেবারে ইন্দোর রাজ্যের সীমায় গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। উক্ত রাজ্য তৎকালে বিখ্যাত মাহাট্টা মূলহর রাউ হলকারের অধীন। হলকার নিকৃষ্ট ছাগপালের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ছিল এবং তিনি উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, নতুবা তিনি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেরূপ প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব ও রাজ্যলাভ করিতে পারিবেন কেন? হলকার নিজে বীরকুলের সম্মান করিতে জানিতেন। তিনি যখন জানিলেন যে বীর শ্রেষ্ঠ বুধসিংহের বীরাঙ্গনা পত্নী, বিখ্যাতনামা জয়সিংহের ভগিনী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার রাজ্যে অভ্যাগতা হইয়াছেন, তখন তিনি অবিলম্বে রাজমহিষীর শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন "আপনি বীরপূজ্য

চৌহানকুলের রাজমহিষী, জগন্মান্ত কুশাবহ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাদের পূজনীয়া, আমাকে অন্ত জ্ঞান করিবেন না। আজ হইতে আমাকে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া জানিবেন। আমাদ্বারা আপনার যদি কোন কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, তাহা সাহ্লাদে করিব। আপনি আমাকে মাহারাট্টা দস্যু বলিয়া ঘৃণা বা অবিশ্বাস করিবেন না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমাদ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হইতে পারে, সে উপকার সাধনের জন্ত আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইব না।" হলকারের অভাবনীয় আতিথ্যসৎকারে বুন্দিরাজ-মহিষী যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি তখন স্বকার্য্য সাধনের একমাত্র উপায় মূলহররাউকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং নিজের অভিপ্রায় সমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট সৈন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হলকারও একদল গোলন্দাজ সৈন্ত এবং দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মাহারাট্টা সৈন্ত দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি স্বয়ং তাঁহার সমুদয় সৈন্ত লইয়া তাঁহার ধর্ম্মভগিনীর সাহায্য এবং ধর্ম্মভাগিনেয় উমেদকে বুন্দি সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্ত নর্ম্মদা পার হইবেন।

উমেদ-মাতা হলকারের নিকট এই রণনিপুণ সৈন্তদলের সাহায্য পাইয়া অগোণে নর্ম্মদা পার হইয়া তাঁহার বিশালবাহিনী একবারে বুন্দি অভিমুখে চালনা করিলেন এবং বুন্দির অদূরে বীরবালক উমেদ তাঁহার রণদুর্ম্মদ হারসৈন্ত লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মাতা পুত্রের বিষম জিঘাংসার মুখে বিশ্বাসঘাতক দলিল সিংহ ও তাহার রক্ষক অম্বর সৈন্তগণ সদলে পরাজিত ও তাড়িত হইয়া বুন্দি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উমেদ মাতা একেবারে সদলে বুন্দি প্রবেশপূর্ব্বক প্রিয় পুত্র উমেদকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সধবা।

সধবা—সধবার কথা বলিতে গিয়া বিবাহের কথা একটু বলি, কেন না কন্তার বিবাহ বাঙ্গালীর পক্ষে আজ কাল বড় "ভয়ানক ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অপরিমিত অর্থলালসা পরিণয়ার্থিনী

বালিকাদিগের দুরদৃষ্টের কারণ হইয়াছে। এখনকার যুবকেরা শ্বশুরের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া নিজের চিরদিনের সংস্থান করিতে চাহেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ ব্যক্তি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ; এই কারণে কন্যার বিবাহ দিতে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে দরিদ্র ঘরের বালিকারা "রূপে লক্ষ্মী" ও "গুণে সরস্বতী" হইয়াও অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। পূর্ব্বে টাকা দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হইত, * এখন সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সর্ব্বস্ব দিয়—শ্বশুরকে সর্ব্বস্ব দিয়া জামাতা আনিতে হয়! "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলা দপি" এই মহা বাক্য এখন বাঙ্গালায় কথার কথা হইয়া আছে! তবে বিশেষ আশা ও আহ্লাদের বিষয় এই যে কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয় এই কদাচার দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কেহ কেহ নিজ পুত্র প্রভৃতির বিবাহে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতেছেন। এই দুর্ঘটনা নিবারিত না হইলে দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িবেন ও সংসারাশ্রম অনেকের পক্ষেই দারুণ ক্লেশকর হইবে।

এইখানে বলা আবশ্যক পিতা মাতা ও অভিভাবকগণই বঙ্গীয় বালিকার বিবাহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী। তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে বালিকার পরিণয় হইয়া থাকে। অভিভাবকেরা যদি সুবিচারক ও পরিণামদর্শী হন, তাহা হইলে এ প্রথাটী অতি কল্যাণকর সন্দেহ নাই। (১)

বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বঙ্গীয় বালিকাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (২) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল বিবাহের একবৎসর পরে ও অযুগ্ম বয়সে নব বধূ শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন। এখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আজি কালি বিবাহের অল্প দিন পরে বালিকারা পতিগৃহে যাইতে বাধ্য হয় ; কখনও বা নব-বিবাহিত যুবক শ্বশুরগৃহে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইহার অশুভ ফল অনেকে বুঝিয়াছেন ; আর এ সম্বন্ধে আমরা নিজের ভাষায় কিছু বলিতেও অক্ষম, যিনি এ বিষয়ের ফলাফল জানিতে চাহেন, তিনি ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের "নব্যভারত" পত্রে "বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিবেন। উক্ত প্রবন্ধ-প্রণেতা একজন শারীরবিদ্যাবিৎ, তাঁহার যুক্তিযুক্ত লেখার

* কোনও কোনও বংশে এ প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(১) স্বার্থপর কি নির্ব্বোধ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে অমৃতে গরলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(২) ইহার অন্যথাও দেখা যায়। কোথাও বালিকারা সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়সে বিবাহিতা হয়।

বাঙ্গালীর শরীর, মন ও সমাজ বহুল পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবে। যাহাহউক শ্বশুরালয়ে গমন করা নব বধূর পক্ষে এক গুরুতর ব্যাপার। বালিকা-জীবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা এই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিতা কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং
সপত্নীজনে (৩)
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম
প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগে-
ষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ
কুলস্যাধয়ঃ॥"

আজি বাঙ্গালার প্রত্যেক বিবাহিতা রমণী এই উপদেশের পাত্রী। নববধূর জীবন সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতার পূর্ণ আদর্শস্বরূপ। আমাদের বোধ হয় পুরাকালে মনুষ্যত্ব লাভের আশয়ে শিষ্যকে যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া গুরু-গৃহে দাসত্ব করিতে হইত, নব বধূকেও সেইরূপ সুগৃহিণী করণার্থে শ্বশুরালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হয়। বিরক্তি, আলস্য প্রভৃতি মানুষের স্বাভাবিক; ইহার বশীভূতা হইয়া পাছে বালিকা রুক্ষস্বভাবা হয়, সেই আশঙ্কাতেই তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী এবং সেই আশঙ্কাতেই গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ-বিবর্জ্জিতা। এই প্রথা প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের হাতে সোণা পড়িয়া পিত্তল হইয়া যাইতেছে! তাই শ্বশ্রূ, বধূ কেহই সুখী হইতে পারিতেছেন না।

সাংসারিক নিয়মে নববধূ নিরক্ষরা বা নির্ব্বোধ হইলে শ্বশ্রূ প্রভৃতি তত বিরক্ত হন না। তিনি লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতাপরায়ণা, মৃদুস্বভাবা ও গৃহকর্ম্ম-নিরতা হইলেই পতি-গৃহে "লক্ষ্মী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার অন্যথায় শ্বশ্রূ, বধূকে দেখিতে পারেন না; ননন্দা বচসা করেন, যাতৃগণ হিংসার চক্ষে দেখেন। বধূরাও গৃহ-পরিচর্য্যারূপ "আপদ বালাই" ছাড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইতে পারিলে রক্ষা পান। কিংবা পরস্পরে বিবাদ কলহ করিয়া, গৃহকে অশান্তি ও অসুখের আগার করিতে থাকেন; এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতেও স্ত্রীজাতিকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

রুচি সকলের সমান নহে। একথা যে আজি নূতন বলিলাম তাহাও নহে; কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" আমরা এ বিষয় সত্য বলিয়া জানি। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "এই রুচি বৈচিত্র্যই লোক বৈচিত্র্যের কারণ (৪)" আজি কালি নব্য যুবকেরা যে যেরূপ রুচিবিশিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের গৃহ-লক্ষ্মীরাও সাধারণতঃ সেই সেই আদর্শে

(৩) বর্ত্তমান সময়ে (বহুবিবাহ নিবারিত হওয়ায়) সপত্নীর পরিবর্ত্তে যাতা, ননন্দাদিগের প্রতি প্রিয়সখী-ব্যবহার কর্ত্তব্য।

গঠিত হইতেছেন; স্বামীর একান্ত অনুগত হওয়া বঙ্গ মহিলার স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামী বঙ্গরমণীর প্রতিপালক, শিক্ষক ও জীবন-রক্ষক। রমণীর সুখ, শান্তি, ধন, মান, অধিক কি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত স্বামীর উপর নির্ভর করিতেছে; এরূপ স্থলে স্বামীর বশীভূতা হওয়া রমণীর যে প্রাকৃতিক কার্য্য, এ কথা অনেকে স্বীকার করিবেন। স্বামীই স্ত্রীর নিকট আদর্শ মানব। এই কারণে সংসর্গ গুণে, প্রায়ই দেখা যায়, স্বামীর রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে স্ত্রীর রুচি প্রকৃতি গঠিত হয়। স্বামী সাহেবী ধরণের পক্ষপতী হইলে স্ত্রী মেম, স্বামী কৃপণ হইলে স্ত্রী কৃপণা, স্বামী স্বার্থপর হইলে স্ত্রী স্বার্থপরা, স্বামী সুশীল হইলে স্ত্রীও সুশীলা, সচরাচর এইরূপই হয়। আজি কালি অনেক পুরুষ স্ত্রীর বিলাসিতায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকে কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিবেন। স্বামী উপন্যাস পড়িয়া, স্ত্রীকে উপন্যাসের নায়িকার মত রূপবতী দেখিতে চাহেন; স্ত্রী, বঙ্গ রমণী, হীরা, মুক্তা, গাউন, কৃত্রিম লাবণ্যের মাধুরীতে সৌন্দর্য্যপিপাসু পতি-দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা বিচার করিয়া বলুন এ টা কি নব্য যুবকের স্বকৃত ব্যাধি নয়? এখন "টাকায় কুলাইতে পারি না" বলিয়া নাকে কান্না ধরিলে কেন? তবে যদি নিতান্ত অক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে নিজের রুচি মার্জ্জিত কর, স্ত্রীকে ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিখাও, বাঙ্গালীর মেয়েকে পরী বা অপ্সরী দেখিতে চাহিও না। স্বামী যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, রমণী সেই আদর্শে "মানুষ" হইবেন। আবার ইহাও বলি, কোন কোন স্থলে এরূপ কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়; ব্যতিক্রম স্থলেই দম্পতির অমিল হইয়া থাকে। এমনও হইয়া থাকে যে স্বামী কম্‌টের দর্শন, মিলের যুক্তি, কিকিরোর বাগ্মিতা আলোচনা করিতে ব্যস্ত, আর স্ত্রী ভাল জ্যাকেট কিনিতে, "সরস্বতী হার" পড়িতে বা "ব্রেসলেট" (Bracelet) পরিতেই ব্যস্ত; স্বামী কখন দেশের কোন ভাল কাজে লাগিবেন সেই চেষ্টায় রহিয়াছেন, স্ত্রী নিজের ঘর কন্নার কাজ গুলি কিরূপে পরকে ধরিয়া সারিয়া লইবেন, সেই কথাই ভাবিতেছেন; স্বামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক, স্ত্রী তিন চারি বছর ধরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে যে "কর্ম্মভোগ" ভুগিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন; এমন অবস্থায় কি কখনও দম্পতির মনে মিল হইতে পারে? আবার এদিকে কত সুশীলা ও গুণবতী ভার্য্যা অপাত্রে পরিণীতা হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। যাহাহউক যাঁহার স্বামী কৃতবিদ্য ও স্ত্রী-শিক্ষানুরাগী, তিনি পতিগৃহে আসিয়া লেখাপড়া বা জ্ঞানালোচনা করিতে সমর্থ হন। বঙ্গদেশে

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত কিছুই নাই। মফঃস্বলের অবস্থা একান্ত শোচনীয়; সহরে খৃষ্টান মহিলারা অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইতেছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবারবর্গের শিক্ষার জন্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, তবে দুই একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ, হারমোনিয়ম বা পিয়ানোর দুই, চারিটী গৎ বা গান ও কিছু শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইয়া থাকে। বঙ্গমহিলার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবশ্য এ সকল নহে। শিল্পকার্য্য অর্থে আজি কালি মহিলাগণ উলের কাজ, ঢাকাই রুমাল, কি বড় জোর শালের কল্কা বুঝেন। শিল্প শিখিতে উহাই শিক্ষা করেন। আধুনিক শারীর-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা উলের টুপী, মোজা, কম্ফর্টার প্রভৃতি আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ঢাকাই রুমাল ও শালের কল্কা কিছু অবশ্য ব্যবহার্য্য জিনিস নহে, তবে ইহা সৌখীন ব্যক্তিদিগের আদরের সামগ্রী বটে। অতএব এই সকল শিল্প অপেক্ষা জামা, বডী, দোলাই, লেপ, তোষক, মশারি, বালিস প্রভৃতি সেলাই শিখিলে তাহা আমাদের অধিক প্রয়োজনে আইসে। আমাদিগের পুরাতন শিল্প কাঁথা, ক্ষীরের ছাঁচ, সিকা বুনা প্রভৃতিও আমাদের অবহেলনীয় নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই সকল কাজ শিখাইতে আজি কালি লোক জুটে না। এখন অনেক স্থানে স্ত্রী-হিতৈষিণী সভা সমিতি হইয়া অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু মহিলারা উপযুক্তরূপ শিক্ষা না পাওয়াতে উত্তরপাড়া হিতকরী, মধ্য বাঙ্গলা সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা গুলির মহদুদ্দেশ্য সকল সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না। এখনও পল্লীগ্রামে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক জ্ঞানালোচনা করিতে বিতৃষ্ণ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন "সংসারের কাজে সময় পাই না" অথচ যে সময় তাঁহারা তাস খেলিয়া, গল্প করিয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেন, সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে কত উন্নতি লাভ করিতে পারেন! কিন্তু অধিকাংশের মনের ভাব এইরূপ যে নিজেরা তো উন্নতি ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তারপর স্বজাতীয় কোন ভগ্নীকে জ্ঞানার্জ্জন করিতে দেখিলেও বিরক্ত হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য কেহ কেহ গৃহকর্ম্ম হইতে অবকাশ পাইলেই জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন; এরূপ অবস্থায় যিনি স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে "সৌভাগ্যবতী" বলিতে পারা যায়।

এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক-

দিগের একটী বিশেষ দোষ জন্মিতেছে, সহরেই এ দোষের প্রাবল্য হইয়াছে। এখনকার বধূরা পতিগৃহে গিয়া আর বাটনা বাটা, কুটনা কুটা, দেশীয় ভাত তরকারী রাঁধা প্রভৃতি "নীচ কর্ম্ম" করিতে চাহেন না। আধুনিক সভ্যতা বা রীত্যনুসারে তাঁহারা নানা রকমের সাজগোজ করিয়া একখানা নাটক, নয় কতকটী উল, একান্ত পক্ষে এক যোড়া তাস ও তিনটী সহচরী লইয়া দিন কাটাইতে পারিলেই সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। স্বহস্তে সাংসারিক কাজ করা অপেক্ষা অনাহার-যন্ত্রণাও তাঁহারা শ্রেয়স্কর মনে করেন। যেদিন "বামুন দিদী" রন্ধনশালায় না আসিবেন, সেদিন আত্মীয় স্বজনকে দোকানের বাসি খাবার খাওয়াইবেন, তবুও কয়লার আঁচে পুড়িয়া "ডাল ভাত" রাঁধিতে পারিবেন না। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই ইঁহাদের স্বামী মহাশয়ও এরূপ কার্য্য অনুমোদন করেন; তাঁহার বিবেচনায় "ওর শরীর খারাপ, আগুণের তাপ লাগাইলে দুদিনেই শয্যাগতা হইতে হইবে।" তিনি নিজের মা'কে, ঠাকুরমা'কে, তিন বেলা আগুণের তাপ লাগাইয়া সুস্থ থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু এখন এই সভ্যতার ছড়াছড়ির দিনে সে পুরাতন কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক স্ত্রীলোকের এরূপ বিলাসিতা ও আলস্যপরতা স্ত্রীমাত্রেরই বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। যাঁহাদের অনুকরণ করিতে চাও, তাঁহাদের গুণগুলি ছাড়িয়া দোষগুলি গ্রহণ কর কেন? দেখ দেখি বিবী কার্লাইল, বিবী গ্লাডষ্টোন, কুমারী সার্লট্ ব্রণ্টি প্রভৃতি মহদাশয়া রমণীরা সাহিত্য-অনুশীলন, রাজনীতি পর্য্যালোচনা প্রভৃতি উচ্চতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বহস্তে কত সামান্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, আর তুমি আমি ঘরের কোণে বসিয়া কে কি দিয়া ভাত খাইতেছে, এই খবরটী সংগ্রহ করিতে গিয়া যদি গৃহকর্ম্মে অক্ষম হই, তবে সে কত লজ্জা ও কত ক্ষোভের বিষয়!

যথাসময়ে বঙ্গাঙ্গনা সন্তান-প্রসূতা হন। এখন ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ বৎসর বয়সের মধ্যেও অনেক রমণী (কি বালিকা) সন্তানের জননী হইতেছেন। এই সকল সন্তান যেরূপ সুস্থ, সবল ও মানসিক ক্ষমতাপন্ন, তাহা মাতার বয়সের হিসাবেই বুঝা যায়। মাতৃকর্ত্তব্য পালন স্ত্রীজাতির এক গুরুতর দায়িত্ব, এই সকল বালিকা-জননীরা অধিকাংশই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞা। ইঁহারা যেরূপে সন্তান পালন করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে দেশীয় মাতাদিগের মধ্যে, রাজা রামমোহন রায়ের মাতা, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের জননী, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের মাতা, অনারেবল গুরুদাস বাবুর জননী প্রভৃতি মহোদয়াদিগের ন্যায় উন্নতমনা মাতৃগণও আছেন। তাঁহাদিগের প্রকৃত

রত্নরাজি দ্বারা এই আঁধার দেশ আলোময় হইতেছে ও হইবে। আবার দুঃশীলা ও অসংযতেন্দ্রিয়া জননীগণ এক একটী মনুষ্যাধম সন্তান প্রস্তুত করিয়া ইহলোকে নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ও পরলোকের জন্যে পাপ সঞ্চয় করিতেছেন। * সুসন্তানই "নরাণাম্ পুণ্যলক্ষণং" কুসন্তান মহাপাপের ফল! এখন সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় কোন কোনও সদাশয় ব্যক্তি সন্তান পালন নীতি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। যদি দেশীয় জননীরা ছাই ভস্ম পুস্তকের "পত্র-কীট" না হইয়া বাবু শিবচন্দ্র দেব কৃত শিশুপালন, স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত মাতৃশিক্ষা, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু কৃত নারীনীতি, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ধাত্রী ও প্রসূতিশিক্ষা, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত মা ও ছেলে, প্রভৃতি সৎগ্রন্থ গুলি পড়িয়া তদনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলেও রমণী-জন্ম নিষ্ফল হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানপ্রসূতা হইয়া অনেক রমণী লেখা পড়ার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেন। বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শক কত ব্যক্তি কত সময় বলিয়া থাকেন "বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদিগের প্রতিভা যেমন শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সহসা নিবিয়া যায়। প্রাপ্তবয়সে ইহারা সমস্তই ভুলিয়া যায়।" তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলে হইতে পারেন, আমরা ভুক্তভোগী; আমরা ইহার কারণ এই বুঝিয়াছি যে বৃক্ষের অঙ্কুরটী যেমন যত্ন অভাবে শুকাইয়া যায়, বঙ্গাঙ্গনার প্রতিভাও সেইরূপ অনুশীলন অভাবে বিলুপ্ত হয়। সুকবি বলিয়াছেন "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে "গাইতে গাইতে গাইয়ে হয়" অর্থাৎ অনুশীলনই উন্নতির মূল।" যে বয়সে প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে, যে বয়সে স্বাধীন চিন্তা সকল প্রদীপ্ত হইবে, যে বয়সে স্মৃতি, মেধা, কল্পনা সকল পুষ্টিলাভ করিবে, সেই বয়সে বঙ্গাঙ্গনা সরস্বতী দেবীর সঙ্গে দলাদলি করিয়া বসেন; বাল্যকালে কতকদিন যে মানসিক শ্রম করিয়াছিলেন, এখন চতুর্গুণে তাহার পরিবর্ত্তে আরাম লাভ করিতে থাকেন। এই জন্যই একাদশ বর্ষ বয়সে যে বালিকা বিদ্যালয়ে উত্তমা ছাত্রী ছিল, একবিংশতি বর্ষ বয়সে তাঁহাকে অর্দ্ধ মূর্খ রমণী বলিলে বলা যায়। দশ বৎসরে মধ্যে তিনি এতদূর পিছাইয়া পড়েন! যদি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশীয় সদাশয় ব্যক্তিগণ মনোযোগ করেন, যদি মুখের কথা, কাজের উপরে হইয়া

* মাতৃদোষেই কবিবর বাইরণের মত লোক চরিত্রবান্ হইতে পারেন নাই, অন্যের কথা কি বলিব?

উঠে, তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় ঘটনা কখনই হয় না।

যে রমণীর জ্ঞানেচ্ছা প্রবল, তাঁহার আন্তরিক যত্নে তিনি কতক দূর শিক্ষিতা হইতে পারেন। এমনও দেখা যায় স্ত্রী জ্ঞানার্জ্জনে বা গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী হইয়া কেবল স্বামীর শাসনের ভয়ে ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আসল কথা, প্রথমে যাহা বলিয়াছি, স্বামীর রুচি অনুসারে স্ত্রীর জীবন গঠিত হইতে থাকে; মৌলিক না হইলেও আংশিকরূপে স্বামীর সহিত স্ত্রীর জীবন অথবা জীবনের সর্ব্বস্ব বিনিময় হয়।

সধবা বঙ্গ মহিলার প্রাপ্তবয়সে গৃহমধ্যে কতক দূর প্রভুত্ব থাকে। যাঁহার স্বামী যত উপার্জ্জনক্ষম ও ক্ষমতাপন্ন পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব তত বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা (তারক বাবুর) স্বর্ণলতার প্রমদা সরলার আখ্যায়িকা পাঠ করিতে বলি। যাহা হউক একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, রমণীগণ সধবা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, স্বাধীনা ও ক্ষমতাপন্না হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বেলা প্রায় এগারটা। গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ। সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত! এমন সময় সরোজিনী তাহার প্রাণসম নয়নের মণি একমাত্র শিশু কুমারকে গৃহের এক প্রান্তে শায়িত করিয়া রাখিয়াছে। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপফুলের ন্যায় শিশুর মুখকমল প্রফুল্ল। নিদ্রার মোহিনীশক্তি তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিয়াছে। তবুও মধুর হাসি চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধরের অপরিসীম শোভা সম্পাদন করিতেছে। সরোজিনী নিশ্চিন্তমনে রন্ধনশালায় নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু বিধির কি অচিন্তনীয় বিধান। হঠাৎ সরোজিনীর কর্ণে এক বিকট চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া দৌড়িয়া যেখানে নবকুমার নিদ্রাগত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল একখানি ইষ্টক স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার প্রাণাধিক সন্তানের মস্তকোপরি পতিত হইয়া শিশুর কোমল মস্তককে নিষ্পেষিত করিয়াছে। দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মায়ের প্রাণে শত শেল বিদ্ধ হইল। যাতনায় অস্থির হইয়া ভূতলে পড়িল। আর সংজ্ঞা নাই। কিছুকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সরোজিনী আর্ত্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ করিল। গৃহবাসী ও প্রতিবাসী

অন্যান্য সকল লোক প্রমাদ গণিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং সকলেই শোচনীয় ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

এই নরহন্তা ইষ্টকখণ্ডকে কেহ দোষী করিলেন কি? ঘটনাস্থলে যত লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই শোকের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু কেহই ইষ্টকখণ্ডকে শাসন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। যদি এই হত্যাকাণ্ড সংজ্ঞাবিহীন জড় ইষ্টক কর্ত্তৃক না হইয়া একজন মনুষ্য কর্ত্তৃক সংঘটিত হইত, তাহা হইলে দর্শকদিগের কার্য্য কেবল শোকোচ্ছ্বাসে পরিসমাপ্ত হইত না। সকলেই হন্তাকে আক্রমণ করিতেন এবং তাহাকে যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত বিচারালয়ে উপস্থিত করিতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই ইষ্টক খানি দোষী নয় কেন? ইষ্টক জড় পদার্থ, জড়শক্তির অধীন। ইষ্টকের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দারা জড় শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে। আমরা যে ইষ্টকখণ্ডের প্রসঙ্গ করিলাম, সেই ইষ্টক খণ্ড যোগাকর্ষণী শক্তি দ্বারা অন্যান্য ইষ্টকের সহিত সংবদ্ধ ছিল। এদিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সর্ব্বদাই তাহাকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিতেছিল। যাই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সংগ্রামে যোগাকর্ষণী শক্তিকে পরাভূত করিল, অমনি ইষ্টক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সরোজিনীর সুকুমার শিশু সেখানে শায়িত থাকিলেও এ ঘটনা ঘটিত, না থাকিলে এ ঘটনা ঘটিত. সুতরাং সরোজিনীর কুমারের হত্যা সম্পূর্ণ আকস্মিক। কিন্তু মানবের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে একজনকে হত্যা করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে তাহার জীবনও রক্ষা করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন ইট যেমন প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, মানুষও সেরূপ প্রবৃত্তির অধীন। যখন প্রবৃত্তির উত্তাল তরঙ্গ মানবের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তখন মানব ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালনে আত্ম-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। তখন প্রবৃত্তির স্রোতে কোন অনভীপ্সীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। তবে কোথায় মানুষের স্বাধীনতা? আর মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে অর্থাৎ মানব ইষ্টকের মত বলবতী শক্তির অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে তাহাকে অপরাধী কর কেন? নরহন্তাটিকে যদি ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মানবকে ছাড়িবে না কেন? যাঁহারা এরূপ যুক্তি করেন, তাহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। স্বীকার করিলাম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি কি স্বভাবতঃই মানব মনে উদিত হইয়া থাকে? না প্রবৃত্তির স্বভাব সম্বন্ধে মানবের স্বাধীনতা আছে? যাঁহারা মানবের স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন, প্রবৃত্তির আবির্ভাব সম্বন্ধেও মানবের স্বাধীনতা নাই। উহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন:—মনে কর সরলা সৌদামিনীর অলীক কুৎসা কাহিনী সকলের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সৌদামিনী যাই সরলার এ দুর্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইল, অমনি তাহার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। সৌদামিনীর এ ক্রোধের উত্তেজনা স্বাভাবিক। সৌদামিনী ইচ্ছা করিয়া ইহার বাধা জন্মাইতে পারিত না। ক্রোধ হইলে তদনুরূপ কাজ হইবেই হইবে। সৌদামিনী ক্রোধ বশতঃ সরলাকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। এজন্য সৌদামিনীকে দোষী করা অন্যায়। আমরা বলি সৌদামিনীর ক্রোধের উদ্রেক স্বাভাবিক নহে। কারণ যে ঘটনার উপলক্ষ করিয়া সৌদামিনীর ক্রোধের সঞ্চার হইল, সুশীলা সে ঘটনাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া যায়। সুশীলা সর্ব্বদা বলে মনকে এরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে যে, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার মনে ক্রোধ উপস্থিত হয় না। ইহাতে বোধ হইতেছে, ইচ্ছা শক্তির সঞ্চালন দ্বারা প্রকৃতির আবির্ভাবের উপরেও আধিপত্য স্থাপন সম্ভবপর। যখন সুশীলা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ক্রোধের কারণ উপেক্ষা করিতে পারে, তখন সৌদামিনীর যে সে শক্তি আছে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সৌদামিনী সে শক্তি ব্যবহার করে নাই বলিয়া ক্রোধের উত্তেজনায় উত্তেজিত। আত্মশক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করে নাই বলিয়া সৌদামিনী অপরাধী এবং দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয়। সুশীলা প্রশংসনীয় ও আদরণীয়, সুতরাং যাঁহারা বলেন মানুষের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা ভ্রম করিয়া থাকেন।

মানুষ ইচ্ছা করিলে সৎ কিংবা অসৎ হইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে একবার কোন কুঅভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হইলে সহজে তাহা দূর করা সম্ভবপর নয়। উহার সংশোধন সময়সাপেক্ষ। এখানে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু কালে অধ্যবসায় সহকারে এরূপ অভ্যাসেরও পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। যে সকল পুরুষ এবং রমণী শৈশবের কুশিক্ষা এবং কুসংসর্গবশতঃ কু অভ্যাসের কঠিনতর নিগড় পায় পরিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হউন। কখনও অদৃষ্টের স্কন্ধদেশে সমস্ত কার্য্যদায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হওয়া বিধেয় নহে। বহু দিনের সঞ্চিত পাপ মুহূর্ত্তে ধ্বংস না হইলেও ভয় নাই। প্রাণগত যত্ন করিলে ইচ্ছা-শক্তির দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইবেই হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছে "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।" —

"ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।"

একটী ঝরিয়া গেলে
আর কি ফোটেনা ফুল ?
ঝরিতে হইবে বলে
তার কি গো ফোটা ভুল ?
দীপটী নিবিয়া গেলে
জ্বালে না কি দীপ আর ?
আবার নিবিবে বলে
রাখে ঘর অন্ধকার ?
একটী ফুরায়ে গেলে
পুনঃ কি করে না আশা ?
বারেক ভাঙ্গিলে গৃহ
ফের কি বাঁধে না বাসা ?
একটী উড়িয়া গেলে
আর কি পোষে না পাখী ?
মনে ভেবে সেও কবে
উড়ে যাবে দিয়ে ফাঁকী ?
আমার উদ্যান আজ
বাসিত সুগন্ধি ফুলে।

ঝরুক সময়ে—কিন্তু
অসময় না কেহ ভুলে॥
আবার জ্বেলেছি দীপ
নিবুক তেল ফুরা'লে,
যেন কভু নিবে নাকো
প্রবল বাতে অকালে॥
আবার হয়েছে আশা
নিরাশ এ হৃদয়ের,
আবার নতুন গৃহ
বাঁধিয়াছি আমি ফের॥
স্নেহের পিঞ্জরে মোর
আসিয়াছে পাখী আর,
থাকে যেন দৃঢ় সদা
ভাঙ্গে না শৃঙ্খল তার॥
গিয়াছে একটা ঝরে
ফুটিবে না আর"—ভুল,
আবার বাগানে মোর
ফুটেছে সুগন্ধি ফুল।

সতীধর্ম্ম।

(৬ষ্ঠ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা হইতে)

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥১॥

'পুরুষ' বলিলে নাহি একটি বুঝায়,
জায়া পতি সন্তানেই পূর্ণতা সে পায় ;
যেই পতি সেই জায়া সেই ত তনয়,
তিনে এক, একে তিন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥২॥

তটিনী সমুদ্র-জলে মিশিলে যেমন,
সমুদ্র-জলের গুণ করয়ে ধারণ ;
যেরূপ গুণের পতি লভে যে রমণী,
সেইরূপ গুণ সেও লভয়ে তেমনি ।২। (১)

কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্তর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৩॥

অতএব কন্যা যদি অনূঢ়া দশায়,
পিতার আলয়ে চিরজীবন কাটায় ;
সেও ভাল, তবু তার আত্মীয় স্বজন,
অপাত্রে বিবাহ নাহি দিবে কদাচন ।৩।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥ ৪ ॥

অধম বংশের কন্যা অক্ষমালা নামে,
বশিষ্ঠে লভিয়া পূজ্যা হৈল ধরাধামে ;
সারঙ্গীও হীন বংশে লভিয়া জনম,
মন্দপাল-পতি-গুণে হৈল অনুপম। ৪।

এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ।৫

এরূপ দেখিবে কত শত নারীগণ,
জনম অধম বংশে করিয়া গ্রহণ,
সাধু-পতি-সমাগম লভিয়া কেবল,
গুণের আলোকে বিশ্ব করিল উজ্জ্বল ।৫।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬ ॥

জীবের জনম-ক্ষেত্র রমণী সকল,
গৃহের আলোক তারা কুলের মঙ্গল ;
রমণী সবার পূজ্য জানিবে সদাই,
লক্ষ্মী আর রমণীতে কোনো ভেদ নাই ।৬।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥৭॥

জীবের জনম কিম্বা জীবের পালন,
রমণী বিহনে নাহি হয় কদাচন ;
এই যে সংসারযাত্রা চলে অনুক্ষণ,
প্রত্যক্ষ দেখিবে তার নারীই কারণ ।৭।

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥ ৮ ॥

বংশরক্ষা আর ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয়,
আর্ত্তের শুশ্রূষা আর পবিত্র প্রণয়,
আপনার আর পিতৃলোকের নিস্তার,
সুভার্য্যাই একমাত্র নিদান তাহার ।৮।

(১) উত্তমের সংসর্গ-গুণে অধমও উত্তম হয়, এবিষয়ে হিতোপদেশে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্ ॥

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকতমণি-শোভা করয়ে ধারণ,
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥

হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে,
সমানের সহবাসে রহে সমভাবে ;
পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন,
বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ।

যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥

উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়,
প্রভাকর-কর-যোগে হয় প্রভাময় ;
হীন জাতি লভি' তথা সাধু-সমাগম,
হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অনুপম।

(মৎপ্রকাশিত হিতোপদেশ, কথারম্ভ, ৪১,৪২,৪৬শ্লোক)

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৯॥

পিতা, ভ্রাতা, পতি, আর দেবর, স্বজনে,
তুষিবে রমণীগণে বসনে ভূষণে;
যতনে রাখিবে সদা করিবে সম্মান,
নারীর কল্যাণে হয় সবার কল্যাণ।৯।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥১০॥

রামাগণে যে ভবনে লভে সদা মান,
দেবতা-বিহার ক্ষেত্র স্বর্গ সেই স্থান;
না পায় সম্মান যথা রমণী সকল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সেই থানে সকলি বিফল।১০।

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥১১॥

কুলনারী যে ভবনে করে হাহাকার,
জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহা হয় ছারখার;
যে গৃহে রমণীকুল পুলকিতচিত,
সে গৃহে সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয় উছলিত।১১।

যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ১২॥

রামাগণে অপমানে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
অভিশাপ যে ভবনে করয়ে প্রদান;
ধন পরিজন আদি সহ সে আলয়,
সমূলে বিনষ্ট হয় জানিবে নিশ্চয়।১২।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ ১৩॥

অতএব অশনে বসনে বিভূষণে,
ধনে মানে নারীগণে তুষিবে যতনে;
বিশেষতঃ ক্রিয়া কর্ম্ম আদি মহোৎসবে,
নারীর সম্মানে যেন দৃষ্টি রাখে সবে।১৩।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥১৪॥

ভার্য্যাগুণে পতি যথা সদানন্দে রয়,
পতি-গুণে ভার্য্যা যথা প্রফুল্লহৃদয়;
এরূপে দম্পতীপ্রেমে শোভে যেই স্থান,
সর্ব্বমঙ্গলার তথা নিত্য অধিষ্ঠান।১৪।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ ১৫॥

রক্ষিতে নারীর ধর্ম্ম তারে বন্ধুগণ,
গৃহে রুদ্ধ রাখিলেই না হয় রক্ষণ;
যে নারী আপন গুণে রক্ষে আপনারে,
যথার্থই সুরক্ষিত জানিবে তাহারে।১৫।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাং চ পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥ ১৬॥

ধন ধান্য প্রভৃতির ব্যয় বা রক্ষণ,
গৃহ গৃহসামগ্রীর নিত্য অবেক্ষণ;
পাক অন্নদান সর্ব্ব দ্রব্যের শোধন,
ধর্ম্মকর্ম্ম নারী-হস্তে করিবে অর্পণ।১৬।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্॥ ১৭॥

সুরাপান, যথায় তথায় বিচরণ,
পতিসনে দীর্ঘকাল বিরহ ঘটন;
কুসঙ্গ অকালে নিদ্রা পরগৃহে বাস,
এই ছয় দোষে হয় সতীত্ব বিনাশ।১৭।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রবসেৎকার্য্যবান্ নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি॥ ১৮॥

ভার্য্যার ব্যবস্থা অগ্রে না করি' বিশেষ,
ভার্য্যা রাখি' পতি যেন না যান বিদেশ;
জীবিকা-অভাবে হায়! জঠর-জ্বালায়,
সুশীলাও কত নারী সতীত্ব হারায়।১৮।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

পত্নীর ব্যবস্থা করি' যাইলে প্রবাসে,
অতি সুনিয়মে পত্নী রবে নিজ বাসে;
নাহি যদি থাকে তার জীবিকা-উপায়,
সাধু শিল্পকর্ম্মে যেন জীবন কাটায়।১৯।

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥ ২০ ॥

জায়া পতি সদা হেন করিবে যতন,
যাহে দোঁহে নাহি হয় বিরহ ঘটন;
কার্য্যবশে ছাড়াছাড়ি হইলে দোঁহার,
কেহ যেন কভু নাহি করে ব্যভিচার।২০।

এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োরপি।
অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ ॥ ২১ ॥

যাবত দোঁহার দেহে রহিবে জীবন,
ব্যভিচার কেহ না করিবে কদাচন;
পবিত্র মনের ভাব পবিত্র আচার,
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এই ধর্ম্ম সার।২১।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ ২২ ॥

কষ্ট হইলেও পতি প্রসন্ন বদনে,
সুচারু সমস্ত কার্য্য করিবে যতনে;
গৃহদ্রব্য সকলি রাখিবে পরিষ্কার,
ব্যয়ের বিষয়ে সদা হবে মিতাচার।২২।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

জীবে দয়া।

দয়া মানব হৃদয়ের একটী শ্রেষ্ঠ ভূষণ। পরের দুঃখকে আপনার দুঃখ করিতে পারা মহত্ত্বের চিহ্ন। এই বৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান। অন্যান্য বৃত্তি সমূহের ন্যায় দয়া বৃত্তিও ব্যবহার দ্বারা উজ্জ্বল ও অব্যবহার দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে। দয়ালু ব্যক্তি অন্যের জন্য অনায়াসে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। স্যার ফিলিপ্ সিড্নি জাট্ফেন যুদ্ধে আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান কালে পিপাসাতুর হইয়া এক গ্লাস জল আনিতে অনুরোধ করেন। জল আসিল, সিড্নি মুখে গ্লাস তুলিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন নিকটবর্ত্তী একজন সৈন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সকাতরে তাঁহার হস্তস্থিত বারিপূর্ণ পাত্রের দিকে তাকাইতেছে। সিড্নি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "উহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। উহাকে এই বারি প্রদান কর।" একবিন্দু বারির অভাবে যখন প্রাণ বহির্গত হইতেছে, এমত সময়ে কে এরূপ আত্মোৎসর্গ ও নিঃস্বার্থভাব দেখাইতে পারে? সিড্নি জীবনে যত মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালের এই কার্য্য তৎসমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রচারিত। যাহার হৃদয়ে এই বৃত্তি সে প্রকার স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, তাহার

পক্ষে মহাত্মা সিড্‌নির তুল্য মহাজনগণের পুণ্যকাহিনী উপকথা বলিয়া বোধ হইবে।

দয়া পাপীর উদ্ধারের হেতু ও দুঃখীজনের শান্তির উৎস। বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যের প্রাণ যদি দুঃখী পাপীদের জন্ত না কাঁদিত, তবে সংসার-যন্ত্রণা আরও যে কত দুঃসহ হইত বলা যায় না।

নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়; কিন্তু দয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান গুণত্রয়ের মধ্যে দয়া একটী। মহর্ষি ঈশা শৈলবেদীর উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন—"দয়ালু ব্যক্তিগণ ধন্য ; কারণ তাহারা (ঈশ্বরের) দয়া লাভ করিবে।" মুসলমান ধর্ম্মে বলে "উপাসনা প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মাঙ্গ পালন করিয়া মনুষ্য স্বর্গের দ্বারদেশে মাত্র উপস্থিত হইতে পারে,দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান ভিন্ন তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমাবতার গৌরচন্দ্র সনাতন গোস্বামীকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন ;—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন,
এই তিন কর্ম্ম তুমি করো সনাতন।"

বুদ্ধ সিদ্ধার্থ যে অপূর্ব্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। বৌদ্ধ সাধকগণ রজনীযোগে ভ্রমণ করিতেন না, কারণ পাদদলিত হইলে অনেক জীবের প্রাণ সংশয় হইতে পারে। মুখ ও নাসিকার মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিবে বলিয়া তাঁহারা ঐ দুই ইন্দ্রিয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন এবং দিবাভাগে পথে চলিতে হইলে পথ দেখিতে দেখিতে ও পরিষ্কার করিতে করিতে পদবিক্ষেপ করেন এবং একটী পিপীলিকা পাদদলিত হইলে হৃদয়ে বড় ক্লেশ অনুভব করেন। বৌদ্ধগণের দয়া সাধন এত দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, তাঁহারা খট্টাতে ছারপোকা পালন করেন ও অর্থ পুরস্কার দিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই খট্টায় শয়ন করাইয়া তাহা দ্বারা নর-শোণিত পান করান।

খৃষ্টানগণের দয়া নানা দেশে নানা কার্য্যে ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও উহা নানা আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্রই দয়াধর্ম্মের সহিত 'নিরামিষ ভোজন' প্রচারিত হইয়াছে। নানা কারণে ইউরোপ খণ্ডে আমিষ-ভোজন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অধুনা তথায় নিরামিষ আহার প্রচলিত হইতেছে এবং দিন দিন নিরামিষভোজীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দয়াধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে "জীবের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণী সভা" সংস্থাপিত

হইতেছে। ইউরোপীয়েরা সভা স্থাপন দ্বারা সকল কার্য্য করেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া সেই সকল মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান সকলেই আজকাল বুঝিতেছেন যে, মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, দয়া অর্থে জীবে দয়া। জীব অর্থে 'কৃষ্ণের জীব', কেবল মানুষ নহে। ইংলণ্ড দেশের পূর্ব্বতন মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কবি কাউপার ও জন্‌সনের পশুর প্রতি দয়া যথেষ্ট ছিল।

অধুনা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ পশুগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহাদের এই নৃশংসতা নিবারণার্থে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার একজন অধিনায়িকা কুমারী ফ্রান্‌সিস্ পাওয়ার কব্। তিনি একজন ব্রহ্মবাদিনী। প্রেমরূপিণী নারীর সুকোমল হৃদয় যে বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের জন্য কান্দিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কুমারী কব্ ও অন্যান্য করুণহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় মানব সমাজের মন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠুরতা হইতেও নিবৃত্ত হইতেছে। কালে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে এবং হৃদয়ের নিকট বিজ্ঞান পরাস্ত মানিবে।

যে যত হীন, যত দুর্ব্বল, যত অযোগ্য, তাহার প্রতি ততই অধিক দয়ার ভাব উদিত হয়। বারির ন্যায় দয়া নিম্নগামিনী। মানুষ বাক্য দ্বারা দুঃখ জানাইতে পারে; তাহাদের দুঃখে ত আমাদের দুঃখ হইবেই; কিন্তু যাহারা বাক্যহীন, যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই, তাহাদের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তির দয়া ধাবিত হওয়া উচিত। ইংরাজেরা যে দেশকে ভল্লুকের দেশ বলেন, সেই দেশবাসী ভল্লুকগণ পর্য্যন্তও পশুদের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণের জন্য চেষ্টিত। সম্প্রতি রুসিয়া দেশে ঐ উদ্দেশে সভা সমিতি সংগঠিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বিড়াল ও ইন্দুর।

আমরা "সান ফ্রানসিস্কো কল" হইতে নিম্নলিখিত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টি সংগ্রহ করিলাম। ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি যে, স্বভাবতঃ বৈরভাবাক্রান্ত প্রাণিদ্বয় একত্রে এক স্বামীর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হইলে এক অদ্ভুত সখ্যভাবাপন্ন হয়।—স্টার ক্রীক নামক স্থানে জনৈক শ্রমজীবী কর্ম্ম করিত। তাহার ঘরে একটি বিড়াল

ছিল। তাহার পাঁচটি শাবক। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে একটী ইন্দুর ক্লান্তভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র, বোধ হয় জলে ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা পাইয়াছে। সে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। বিড়ালমাতা ৫টী শাবকের সহিত যেখানে লুক্কায়িতভাবে শয়ন করিয়াছিল, ইন্দুর আস্তে আস্তে সেখানে গমন করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিড়াল মাতার হৃদয়ে বোধ হয় দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহাকে না মারিয়া শাবকদিগের মধ্যে গ্রহণ করিল এবং আহার দিয়া তাহার কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দুরও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদর্শনে ত্রুট করিল না। ভক্ষ্য ভক্ষকের মধ্যে এইরূপ সম্প্রীতি দেখিয়া শ্রমজীবী পরিবার, যারপর নাই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু কেহ ইহাদিগকে বিরক্ত না করে, এইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করিল। দিনের পর দিন যায়, ইন্দুর বিড়ালদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিল না। প্রত্যুত ইন্দুর ও বিড়ালদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য সখ্যভাব দেখিয়া দর্শকদিগের মন বিমুগ্ধ হইল। ইন্দুর এক্ষণে যথেষ্ট আহার পাইয়া বেশ স্থূলকায় হইয়াছে। সে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আবার বিড়াল মাতার নিকট আসিয়া বাস করে!

নূতন সংবাদ।

১। মণিপুরের রাজবিচার শেষ হইয়াছে—বিচারকদিগের মতে মহারাজ কুলচন্দ্র মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা দোষে দোষী এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ তদুপরি কুইণ্টন প্রভৃতির হত্যার সহায়তা করিয়া আর একটী দোষ করিয়াছেন। উভয়ের প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এখন রাজপ্রতিনিধির কি অনুগ্রহ হয়!

২। জুন মাসের শেষে ময়মনসিংহ নাটোর প্রভৃতি স্থানে বার বার ভূকম্পন হইয়া বিভীষিকা দেখাইয়াছে।

৩। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে নিরামিষ-ভোজীদিগের এক ভজনালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৪। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাতের স্বাস্থ্য মহাসভায় উপস্থিত থাকিবেন।

৫। বেথুন কলেজের কুমারী প্রভাবতী রায়, নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমকুসুম সেন যথাক্রমে ২০৲, ১৫ এবং ১০ টাকার জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। উদাসীন পথিকের মনের কথা—কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া মীর মহাতাব আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তক খানি নীলকরের অত্যাচার বিষয়ক। গ্রন্থকার এই অত্যাচার কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্দান্ত নীলকরেরা কি প্রকারে কুলি সংগ্রহ করিত, চা বাগানে কি প্রকার কষ্টে তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইত ইত্যাদি বিষয় সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য কন্যা কৃতার্থের সতীত্ব, আদরের ধর্ম্মানুরাগ, কেনীর অর্থ লালসা ইত্যাদির চিত্র, অতিশয় প্রশংসনীয়। ইহার ভাষাও বেশ সরল ও সুন্দর, মুসলমানগণ যে এত সুন্দর বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক লিখিতে সক্ষম, ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

২। অদৃষ্ট—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তক খানি কাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। গ্রন্থকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দে বোধ হয় এই প্রথম লেখা। ইহার ভাব মন্দ না হইলেও ভাষা বড়ই কঠিন। ভাষার দোষে অনেক স্থলে ভাবেরও ব্যত্যয় হইয়াগিয়াছে। স্থানে স্থানে কবিতা মন্দ হয় নাই।

৩। বিকাশ—শ্রীসুরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ যেমন সুন্দর, কবিতাগুলি সেইরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের বেশ কবিত্ব শক্তি আছে এবং যে বিষয়গুলিতে এই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কবিত্বের সার্থকতা হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা পড়িতে পড়িতে গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়।

৪। যোগনাথ—একটী চিত্র, মূল্য ।৵০ আনা। ইহা একটী আদর্শ জীবন সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র গল্প। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মযোগের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছে। অনন্তের প্রেমে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া জীবন কাটাও, ইহার সার কথা। পুস্তকখানি পাঠে চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মভাবোন্নতির সম্ভাবনা।

৫। ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি নূতন সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি ;—জন্মভূমি, হিতবাদী, নবযুগ, শ্রীহট্ট মিহির, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি এবং Indian Homœopathic Review. জন্মভূমি অতি সমাদরের সুন্দর মাসিক পত্রিকা। হিতবাদী অনেকগুলি খ্যাতনামা কৃতবিদ্য ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র। অন্যান্য পত্রগুলিদ্বারাও বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা।

বামারচনা।

বালিকা আমার।

গাইছে পরাণ শুধু দুঃখময় গান,—
হৃদয় হয়েছে মম শ্মশান সমান।
কতবার ভাবি মনে,
সুখ স্মৃতি আলাপনে,
মুছিব হৃদয় হ'তে শোকের নিশান।
(কিন্তু) বারণ মানে না হৃদি গায় দুঃখ গান।১

কত দিন এই ভাবে রয়েছি বসিয়া,
আমার স্নেহের নিধি গিয়াছে চলিয়া—
হৃদয়ের প্রিয়তর,
সে বালিকা মনোহর,
অকালে যাইল কেন আমারে ত্যজিয়া?
সেই দিন হ'তে আজো রয়েছি বসিয়া।২

আর কি কখন আমি সে মুখানি হেরিব?
আর কি আদরে তারে হৃদয়েতে লইব?
কত আশা ছিল মনে,
লইয়া স্নেহের ধনে,
সস্নেহে তাহার সেই মুখ খানি চুমিব—
যতনে সে বালিকারে হৃদয়েতে রাখিব।৩

হায়! এপোড়া কপালে যদি সেই সুখ
থাকিবে—
তা হলে এ হৃদি কেন আঁখি জলে ভাসিবে?
চির অভাগিনী আমি,
সুখ কি? কভু না জানি,
চিরদিন দুঃখ স'য়ে এজীবন কাটিবে।
চিরকাল পোড়া হৃদি অশ্রুজলে ভাসিবে।৪

স্নেহের সন্তান রত্নে বঞ্চিত হইয়া,
অভাগী জননী কাঁদে বিরলে বসিয়া।
কিবা আর গৃহকাজ,
কি সুখ সংসার মাঝ?
যেখানে সন্তান তার গিয়াছে চলিয়া—
যেতে চায় মন সেথা ধাবিত হইয়া।৫

কোথায় অজানা রাজ্যে গেছে সে রতন
কেমনে পাইব আমি তার দরশন?
সতত হেরিতে তারে,
পরাণ কেমন ক'রে,
কি ব'লে বুঝাব অন্যে হৃদয় বেদন?
জানেন বেদনা মোর ভুক্তভোগী জন!৬

সংসার সুখের সার ভাবি মনেমন।
যে বালিকা সুখে দিন যাপিছে এখন—
জানেনা সে পর পার;
কি যে ঘোর অন্ধকার,
জানে না এ বিশ্ব শুধু মায়ার ছলন—
"সংসার" "সুখের সার" বলে
কোন্ জন? ৭

জগদীশ! কৃপা করি হের কৃপা নয়নে!
কত ব্যথা সবে নাথ! অবলার পরাণে?
অধমা তনয়া আমি,
ভক্তি স্তুতি নাহি জানি,
কৃপা কর কৃপাময় এ অধম সন্তানে!
ঘুচাও এ দুঃখরাশি স্নেহবারি প্রদানে!৮

——শ্রীমতী নি——
পুঁড়া।

শ্বাস-গৃহীত বাহ্য বায়ুর বলে দেহস্থ মলিন শোণিত শ্বাসযন্ত্রে আনীত হয়, তথায় নিশ্বাসানীত বাহ্যবায়ুর অমৃত ভাগ (অক্‌সিজন্) সেই মলিন শোণিতকে পরিশুদ্ধ করে। এই কার্য্য করিতে সেখানে যে অনিষ্টকর বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই অনিষ্টকর বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং গৃহীত বায়ুর অগ্রে অমৃত ভাগ (অক্‌সিজন্) পরিশুদ্ধ শোণিতের সহিত দেহের পুষ্ট্যর্থে সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়।

যদিচ স্থলচর জলচর, ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার জীবেরই শ্বাসকর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি, ঐ প্রাণনকার্য্য সমান দেহে সমানাকারে নিষ্পন্ন হয় না। জীবভেদে ও অবস্থাভেদে উহা বিভিন্নাকার যন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষের শোণিত নাই, কিন্তু তাহাদের দেহে যে রস আছে, সেই রসের দ্বারা তাহাদের শোণিতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; সুতরাং তদ্‌গৃহীত বাহ্যবায়ু ঐ রসকেই পরিশোধিত করে। সেই পরিশুদ্ধ রস বৃক্ষের ত্বক্ দ্বারা পত্রাদি মধ্যে নীত হয় এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে বাহ্যবায়ু সংযুক্ত হইয়া তাহার শোধন কার্য্য সম্পন্ন করে। বৃক্ষের নিশ্বাসযন্ত্র পত্র, তাহারই দ্বারা উহাদের প্রাণনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। পত্রে ও ত্বকে শিরাসদৃশ সৌত্রিক সংস্থান আছে; তদ্দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্ব গাত্রে রসাদি সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষদেহ পরিপুষ্ট করে।

লতা ও পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবের দেহ পার্শ্বে এক সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, বায়ু সেই ছিদ্রের দ্বারা তাহাদের দেহমধ্যে নীত হয়, হইয়া তত্রস্থ সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে চালিত হইবার সময় ঐ সকল জীবের দেহস্থ রস পরিশোধিত করে। ঐ ছিদ্রগুলিকে শ্বাসছিদ্র, এবং নাড়ীগুলিকে শ্বাসনাড়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবের বুকের মধ্যে স্পঞ্জ নামক বিখ্যাত পদার্থের আকার বহু-ছিদ্র-বিশিষ্ট এক প্রকার মাংসল পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের শ্বাসযন্ত্র। মুখ নাসিকার দ্বারা সেই মাংসল পদার্থে বাহ্যবায়ু নীত হইয়া কথিত প্রকারে প্রাণনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

কুম্ভীর, গোধা, সর্প, ইত্যাদি উভচর জন্তুদিগকে কখন জলে কখন বা স্থলে অবস্থান করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের শ্বাসযন্ত্র অবিকল স্থলচর জীবের শ্বাসযন্ত্রের সমান হইলে চলে না। কারণ, তাহারা যে সময়ে জলমধ্যে থাকিবে, সেই সময়ে তাহাদের শ্বাসাভাবে রক্তের পরিশোধন কার্য্য বন্ধ থাকিবে, তাহাতে তাহাদের দেহে মলিন শোণিতে ব্যাপ্ত হইয়া অচিরে দেহকে পাতিত করিবে। অপিচ, যদি অবিকল জলচর জীবের ন্যায় তাহাদের নিশ্বাসযন্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও তাহাদের স্থলবাস

কালে ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। করুণাময় বিধাতা উক্ত উভয় দোষ নিবারণার্থ উহাদের শরীর মধ্যে একপ্রকার আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা থাকাতে তাহাদের কোনও দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে না। ঐ সকল জীব যে সময়ে জলমধ্যে থাকে, সে সময়ে তাহাদের মলিন শোণিত সেই আধার মধ্যে ন্যস্ত থাকে; পরে যোগ্য সময়ে তাহারা যখন ভাসিয়া উঠে, তখন তাহাদের নিশ্বাসকার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয়, হইয়া সেই মলিন রক্তের শোধন করে। ঐ কারণে সর্প, গোধা ও কুম্ভীর প্রভৃতি কিছুকাল জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারে এবং থাকার উপযুক্ত কাল শেষ হইলেই তাহাদের জলোপরি ভাসমান হইতে হয়। কোন কোন উভচর জীবের ধড়ে এক এক বায়ুকোষ থাকে, তাহাতে তাহারা কিয়ৎক্ষণ ব্যবহারোপযোগী বায়ু লইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়।

মৎস্যেরা নিয়ত জলমধ্যে বাস করে। সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয় বায়ু সেই জল হইতেই সংগৃহীত হয়। মৎস্যের নিশ্বাসযন্ত্র কর্ণকূপ অর্থাৎ কান্‌কো। কান্‌কুয়ার শলাকা সমূহের উপর বহু সূক্ষ্ম শিরা আছে এবং সে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত। জলে স্বভাবতঃই শুদ্ধ বায়ু মিশ্রিত থাকে, মৎস্যেরা সেই বায়ুবিশিষ্ট জল মুখের দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহা কর্ণকূপের (কান্‌কুয়ার) উপর সঞ্চালিত করে। সেই সংস্পর্শে উহাদের কান্‌কুয়াস্থ শোণিত শোধিত হইয়া যায়। অতএব, এই কান্‌কুয়াই মৎস্যজীবের শ্বাসযন্ত্র এবং ইহারই দ্বারা তাহাদিগের প্রাণনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

কোন কোন ক্ষুদ্র জলজ কীটের শ্বাসকর্ম্ম তাহাদের শুঁড় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সেই শুঁড় অতি সূক্ষ্ম ত্বকে আবৃত। তাহাতে তাহাদের দেহের মলিন শোণিত বা রস শুণ্ডে আনীত হইলেই তাহারা শুণ্ড সঞ্চালন করে। সেই সঞ্চালনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলের গতি হয়, সেই গতিতে পুনঃ পুনঃ বায়ুপূর্ণ জলের সংস্পর্শে শুণ্ডস্থ রস পরিষ্কৃত হয়।

মলিন শোণিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্গার পদার্থ থাকে। ঐ অঙ্গার পদার্থ দুরীকরণার্থেই নিশ্বাসকর্ম্মের সৃষ্টি। বায়ুস্থ অম্বরামৃত (অক্‌সিজন্) অংশ নিশ্বাস যন্ত্রে গিয়া শোণিতের সেই আঙ্গারিক পদার্থ দগ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাতেই শোণিত পরিষ্কৃত হইয়া মলিন নীল বর্ণের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই কার্য্য করিতে উক্ত যন্ত্রে যে পৈত্তিকাম্ল বায়ু (কার্ব্বনিক আসিড্) উৎপন্ন হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশ্বাস দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়; দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই বায়ু অর্থাৎ এবম্ভূত নিশ্বাসবায়ু বিশেষ অনিষ্টকর। এই বায়ু গরম ও শরীরনাশক পদার্থে পরি-

ব্যাপ্ত। অধিকক্ষণ ইহার ঘ্রাণ লইলে, মস্তিষ্ক শুষ্ক ও বিকল হইয়া আইসে। ক্ষুদ্র গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক লোক শয়ন করিলে গৃহমধ্য ভাগ নিঃশ্বসিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং সেই নিঃশ্বসিত বায়ু শ্বাসপথে তত্রত্য মানবের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের পীড়া উৎপাদন করে। কলিকাতার পুরাতন দুর্গে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এক সময়ে ১৪৬ জন ইংরাজ কয়েদ রাখিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে ১২৩ জন ইংরাজ উক্ত কারণে এক রাত্রের মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল।

ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে, যদি অনেক মলিন রক্ত শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস যন্ত্রে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সকলের পরিশোধনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণ পরিষ্কার বায়ুর ও শ্বাসকর্ম্মের শীঘ্রতার প্রয়োজন হয়। শ্বাসকর্ম্ম মৃদুভাবে হইলে অধিক শোণিত শীঘ্র পরিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাসক্রিয়া উভয়েরই মৃদুতা ঘটনা হয়। এই জন্যই শ্রমের বিধান ও আবশ্যকতা আছে জানিবে। শ্রম করিলে রক্তের ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-যন্ত্রও দ্রুত বেগে চলিতে থাকে, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র প্রভূত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে। নিদ্রাকালে পরিশ্রম নাই। তখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ থাকে। সেই কারণে সেই সময়ে নাড়ীর ও রক্তের গতি মৃদু হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসও মন্দভাব ধারণ করে। দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত থাকিলেও ঐ কারণে শরীর অলস ও স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে। এ সকল বাক্য মনোনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, জীবের বেগ ও বীর্য্য, বল ও উৎসাহ, নিশ্বাস কর্ম্মের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং নিশ্বাসের ব্যাঘাত হইলে নিশ্চিত বেগের ও বীর্য্যের, বলের ও কার্য্যোদ্যমতার হানি হইয়া থাকে।

যেহেতু শোণিতের সংশোধন করাই প্রণয়-ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য ; পরন্তু উহার দ্বারা আমাদের আরও অনেক উপকার হইয়া থাকে। উহা দৈহিক উষ্ণতার প্রধান কারণ বায়ুর অক্‌সিজন্ (অম্লজান) ও শোণিতস্থ মলিন আঙ্গা-রিক পদার্থ সংযুক্ত বা মিলিত হইবার সময় যে উত্তাপ নির্গত হয়, সেই উত্তাপ দ্বারা দৈহিক উষ্ণতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। শ্বাসের বৃদ্ধিতে উত্তাপের বৃদ্ধি, শ্বাসের অল্পতায় উত্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। পক্ষিনাড়ী মনুষ্য নাড়ী অপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহাদের শ্বাস ও দৈহিক উষ্ণতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষীর স্বাভাবিক দৈহিক তাপ তাপমান যন্ত্রের ১০৮ অংশ ; কিন্তু মনুষ্যের দৈহিক উষ্ণতা ৯৮ অংশ। ঠিক্ এ পরিমাণ থাকে না, কারণ বশতঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াও থাকে। (অপ্রাদি

হইলে ১০৫।৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। কোন কোন জীবের দৈহিক তাপ ৯৫ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

মনুষ্য-দেহের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অনুসারে দৈহিক তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যৌবন অতীত হইলে তাপভাগ অনেক কমিয়া আইসে। সম্প্রতি এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন্ মনুষ্য কত বয়স্ক তাহা জানা যায়।

যে সকল জীবের শ্বাসকর্ম্ম অত্যন্ত মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়, সে সকল জীবের শরীরের উষ্ণতা প্রখররূপে উপলব্ধ হয় না। মৎস্যাদি এই শ্রেণীর জীব। বায়ুর উষ্ণতা যদ্রূপ, ইহাদের দেহের উষ্ণতাও তদ্রূপ। এতদনুসারে তাদৃশ জীবকে শীতল শোণিত আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহাদের দেহ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহাদিগকে উষ্ণ-শোণিত কহে। মনুষ্য ও পশু এই শ্রেণীর জীব। উষ্ণশোণিত জীবদিগের মধ্যে কোন কোন জীব শীতকালে ক্রমাগত ৩।৪ মাস নিদ্রিত থাকে, তখন তাহাদের শ্বাস-ক্রিয়াও দীর্ঘকাল ব্যবধানে মৃদুভাবে নির্ব্বাহিত হয়। এই কারণে তখন সেই সকল জীবের দেহে উষ্ণতার লেশও থাকে না। ইহা কি কারণে ও ঈশ্বরের কোন্ অভিপ্রায়ে নিষ্পন্ন হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

শ্বাসকর্ম্মের দ্বারা জীব-দেহের অপর এক উপকার হইয়া থাকে। শরীর মধ্যে বায়ু না থাকিলে বহির্বায়ুতে শরীরকে একবারে চাপিয়া চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিত। নিশ্বাস যন্ত্রে সর্ব্বদা বায়ু থাকে, তাহারই বলে বাহ্য বায়ুর দাহন অবরোধ করতঃ এই দেহ সংরক্ষিত রাখে। খেচর সকল ইহারই সাহায্যে অনায়াসে আকাশ পথে উড্ডয়ন করে। মৎস্য সকল ঐ উপায়ে ইচ্ছানুসারে জলমধ্যে বিনা ক্লেশে পরি-ভ্রমণ করে, এবং জীবমাত্রেই স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন দৈহিক ভার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ইহার দ্বারা দেহের পুষ্টিও সাধিত হইতেছে। স্বচ্ছন্দ শরীরে মধ্যম পরিমাণ পুরুষ প্রত্যহ ৭০০ চতুরস্র ফিট বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে পরন্তু তাহার ১৫০ ফিট শরীরের পোষণার্থ ব্যয়িত হয়। ঐ ১৫০ ফিটের পরিমাণ অন্যূন ৩৭ ভরি। এখন ভাবিয়া দেখ, আমরা প্রত্যহই ৩৭।৩৮ ভরি অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত পদার্থ নিশ্বাসযন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি অথচ তাহা লক্ষ্য হইতেছে না।

উদাসীনের চিন্তা।

ঘোষালদের বাড়ীর বড় বৌয়ের নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়িয়াছিল। তৎপর স্বামি-গৃহে আসিয়াও লেখা পড়ার একটু একটু চর্চ্চা রাখিয়াছিল। কুমুদিনীর প্রথম সন্তান শিশিরকুমার। পিতা সুশীলচন্দ্র শিশিরকুমারের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় একদিন শুভলগ্নে পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশিরের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। সুশীলচন্দ্র নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই বিদ্যারম্ভের পর হইতেই পুত্রের শিক্ষার ভারটা কুমুদিনীর হাতে প্রদান করিলেন। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন শিশিরকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল না কেন? সুশীলচন্দ্র, অল্পবয়স্ক ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়; এরূপ প্রথার বড় বিরোধী ছিলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর রত্নের মত দুটী ছেলে বিদ্যালয়ের দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বদ হইয়া গিয়াছে। এতভিন্ন তাঁহার নিজের জীবনেও একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন। দুই চারি খানি ইংরেজী গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার এমত আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি পড়িয়াছিলেন "শিশুগণ শৈশব কালে জননীকে খুব ভালবাসে; সুতরাং মা যেমন শিশুর কোমল মনকে গড়িয়া তুলিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না। শিশু মায়ের শিক্ষাধীনে থাকিলে যত শীঘ্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে, বিদ্যালয়ে পুরুষশিক্ষকের অধীনে তাহা কথনই সম্ভবপর হয় না।" তাই শিশিরকুমার গৃহে মায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। একদিন কুমুদিনী একখানি তাসের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড তালব্য "শ" এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—বল দেখি বাবা শিশির এটা কি?

শিশির—"ছ"

কুমুদিনী—না বাছা এটা তালব্য 'শ' আবার বল দেখি।

শিশির—তালব্য "ছ"।

কুমুদিনী—(ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) না এটা তালব্য 'ছ' নয়, তালব্য "শ"; জিভটাকে একটু সরল করে বল।

শিশির—তালব্য "ছ"।

কুমুদিনী—তখন খুব বিরক্ত হইয়া "হতভাগ্য ছেলে বার বার বলছি তালব্য "শ" আর তুই বলবি তালব্য 'ছ'। আবার বল, এবার না বল্‌তে পাল্লে তোকে আচ্ছা শাস্তি দিব।"

তখন শিশির ছল ছল চোখে—তালব্য 'ছ'। এখন আর কুমুদিনী ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, অমনি শিশিরের

গালে এক চপেটাঘাত করিল। শিশির মুখ ব্যাদন করিয়া পঞ্চম-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুমুদিনী 'চুপ কর' 'চুপ কর' বলিয়া শাসন করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলচন্দ্র স্থানান্তরে একটা অফিসের কাগজ লইয়া মাথা ঘুরাইতে ছিলেন। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য শিশিরের পাঠের ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ছেলে চোখ রগ-ড়াইতেছে, শিক্ষয়িত্রী ক্রোধ-বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়া-ছেন। সুশীলচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া "ভাল ব্যাপার টা কি ?" কুমুদিনী স্বামীকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন "ন্যাও তোমার ছেলের শিক্ষা তুমিই দাও, আমার দ্বারা হবে না, হতভাগা ছেলেকে বার বার বল্লেম বল তালব্য 'শ'। পোড়ার মুখো কেবল বল্‌বে তালব্য "ছ"।

সুশীলচন্দ্র ছেলের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'বলত, বাবা তালব্য "শ"।

শিশির—তালব্য "ছ"।

তখন সুশীলচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন শিশিরের কোন দোষ নাই। তাহার জিভ একটু আড়ষ্ট, তাই তালব্য 'শ' উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া শিশিরকে ছাড়িয়া কুমুদিনীর দিকে ফিরিলেন,—ভাল, তুমি যে শিশি-রকে মারিলে, শিশিরের কি কোনও অপরাধ আছে ?

কুমুদিনী—অপরাধ আছে বই কি ? ওকে বার বার তালব্য "ছ" বলিতে নিষেধ ক'রেছি। ও শুন্‌লে না কেন ? এমন অবাধ্য ছেলে অপরাধ করে নাই কি ?

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! একটু বুঝতে চেষ্টা কর মানুষকে অপরাধী বলি কখন ? যখন কোন মানুষ একটা কাজ অন্যায় বলিয়া জানে এবং সেই অন্যায় কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার তাহার শক্তি থাকে, তখন যদি সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলা যাইতে পারে। এখন দেখ শিশির অপরাধের কাজ করেছে কিনা ? সত্য বটে শিশির জানে যে মায়ের অবাধ্য হওয়া অন্যায়, কিন্তু যে শক্তি থাকিলে মায়ের বাধ্য হইতে পারা যায়, শিশিরের সে শক্তির অভাব। জিভের দোষ স্বাভাবিক, জিভের শক্তি না থাকিলে শিশিরের দোষ হইতে পারে না।

কুমুদিনী—ন্যাও, তোমার ন্যায় এখন রেখে দাও। সকল ছেলের জিভ একরূপ আর তোমার ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা তাই তার জিভ আর একরূপ হইয়াছে।

সুশীলচন্দ্র—দেখ কুমুদ আমরা মানুষ, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে। জ্ঞান-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে চলা অমানুষের কাজ। যুক্তিতর্কটা যেন কোন কাজে-রই জিনিষ নয়, এরূপ ক'রে যদি

ইহাকে উড়াইতে দিতে চাও, তাহা হইলে কোন কালেও সত্যে পঁহুছিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে সত্য দর্শন জন্য এক দিব্য চোখ প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বুজিয়া রাখা ঠিক নয়।

কুমুদিনী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া—তোমরা পুরুষ মানুষ যুক্তিতর্ক লইয়া তোমরা থাক। আমাদের উহা সাজে না। এই বলিয়া উঠিতে উদ্যতা হইলেন। সুশীলচন্দ্রের অনুরোধে আবার বসিলেন।

সুশীলচন্দ্র—ভাল কুমুদ! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খোঁড়া ছেলেটি যে সোজা হইয়া চলিতে পারে না, তার জন্য কি তার কোন দোষ হয়েছে?

কুমুদ—পা নাই তার, সোজা হয়ে চলবে কি করে?

সুশীল—তবে কেন একথা বলনা যে সকলের ছেলের পা একরূপ, আর ভট্টাচার্য্যের ছেলে স্বর্গের চাঁদ কিনা যে তার পা অন্যরূপ হবে?

কুমুদিনী—ভট্টাচার্য্যের ছেলের খোঁড়া পা সবাই দেখতে পারে। কোথায় শিশিরের জিভের ত এরূপ কিছু দোষ দেখি না; দিব্যি খায়, কথা বলে, চীৎকার করে, কেবল বুঝি তালব্য "শ"র বেলায়ই তালব্য "ছ"।

সুশীল—দেখ আর নাই দেখ নিশ্চয়ই সুশীলের জিভের কোন স্বাভাবিক দোষ আছে, কোন কোন ছেলের শৈশবকালে এরূপ দোষ থাকে, পরে অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে দোষ সেরে যায়।

কুমুদিনী এখন নিজের দোষ বুঝিতে পারিল, সে অন্যান্য মেয়েদের মত দোষ বুঝিতে পারিলেও বৃথা তর্ক করিত না। নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। তখন সুশীলচন্দ্র সময় পাইয়া শাস্তিসম্বন্ধে দুই চার কথা বলিতে লাগিলেন।

সুশীলচন্দ্র—কুমুদ! তুমি তোমার দোষ বুঝিতে পারিয়া যে ঈষৎ লজ্জিত হইয়াছ, তজ্জন্য আমি খুব আনন্দিত হইলাম। এখন শাস্তিসম্বন্ধে দুই চারটী কথা বলিব।

শাস্তি প্রদানের দুইটী উদ্দেশ্য। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ন্যায়ের পক্ষপাতী ব্যক্তিরাই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। শাস্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অন্যান্য অপরাধ করণোদ্যত ব্যক্তিদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। যদি নিরপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে, শাস্তিদাতার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়া থাকে এবং সে শাস্তিদাতাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী ন্যায়ের শাসন বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে করে। সে নিতান্ত অজ্ঞ লোক হইলে, এই প্রবৃত্তির অনুকরণও করিতে পারে। সুতরাং নিরপরাধী শাস্তি না পায় সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের

দেশে বিচারকগণ এবিষয়ে বিশেষ সাবধান। তাঁহাদের মতে দশজন অপরাধী মুক্তি পায় তাহাও ভাল, তবুও যেন এক জন নিরপরাধী শাস্তি না পায়। এজন্য বিচার কালে কোনও ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আসামীকে সেই সন্দেহের ফল ভোগ করিতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সন্দেহের উপর কোনও আসামীর শাস্তি দেওয়া বিধেয় নহে : কিন্তু শিশির সম্বন্ধে তুমি বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছ। তুমি নিরপরাধী শিশিরকে অনর্থক তিরস্কার এবং প্রহার করিয়াছ; সন্তানদিগকে শাসন করিবার সময় এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্যথা ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিবে না। দ্বিতীয় কথা, নিরপরাধীকে যেমন শাস্তি দেওয়া অন্যায়, গুরুপাপে লঘুদণ্ড ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদানও তদ্রূপ অন্যায়। কিন্তু জননীগণ অধিকাংশ স্থলেই এ নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না ইহার কারণ এই যে তাঁহারা অপরাধীর সংশোধনের জন্য শাস্তি দেন না। অপরাধীর প্রতি বিরক্ত হইয়া মনের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কুমুদিনী স্বামীর এ মহামূল্য উপদেশ স্মৃতিপটে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। যদিও অভ্যাস দোষে কখন কখনও এ নীতি অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি অবশেষে আত্মদোষ স্খালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জননীর সদুপদেশ ও সদৃষ্টান্তে পুত্র কন্যাগুলিও ন্যায়তৎপর হইয়া উঠিল। আশা করি যদি ভারতের জননীগণ এই সুনীতির অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভারত সন্তানের কোমল অন্তঃকরণে শৈশব কাল হইতে ন্যায়পরতার বীজ উপ্ত হইয়া কালে সুফল প্রসব করিবে।

বৌদ্ধ ইংরাজ রমণী।

কর্ণেল্ অলকট্ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কুমারী কেট্ পিকেটকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ব্লাভাস্কির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কর্ণেল যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, কুমারী অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাঁহার সহিত সিংহলে আগমন করেন। ইনি এখানে আসিয়া সঙ্ঘমিত্রা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইনি উক্ত পদে দীর্ঘকাল থাকিয়া সিংহলবাসীগণের হিত সাধন করিতে পারিলেন না। ইনি নিশা রোগগ্রস্ত ছিলেন, সম্প্রতি জলমগ্না হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এ সাধু সংক্ষিপ্ত জীবনের বিষয় কিছু বলিবার নাই। তবে এই মাত্র আমরা অবগত আছি

যে ইহাঁর মৃতদেহের সমাধি হয় নাই, হিন্দুদিগের মত দাহকার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দাহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:— দেহ প্রথমতঃ প্রাচীন মিশরীয়দিগের মত সংরক্ষিত হয়, তৎপরে শবাধারে সংনিবিষ্ট হয়। মুখখানি দেখা যাইতে লাগিল, কারণ আধারের ঐ স্থানে কাচের ঢাক্‌নী ছিল। শ্মশানে ৬।৭ শত বৌদ্ধ মতাবলম্বী শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমবেত হন। প্রথমে বাদ্যকরগণ বাদ্য ধ্বনি করিতে করিতে গমন করে, তার পর বৌদ্ধ ও থিয়সফিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, তার পর শুভ্র সোনালী ও রূপালী বর্ণের কাগজমণ্ডিত শব-শকট অশ্ব-যুগল দ্বারা পরিচালিত। সর্ব্ব শেষে শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ। নারী-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি বিদুষী উইরিকুন, ডাক্তার ড্যালি প্রভৃতি থিয়সফিকেল সোসাইটীর সভ্যগণ শোকসূচক বক্তৃতা করেন। তৎপরে সিংহল-মহিলা উইরিকুন মৃত নারীর আত্মীয় স্থানীয় হইয়া মুখাগ্নি করেন। ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে 'সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। মডেল ফারমে এই শোকাবহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেক য়ুরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। রাজকীয় কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক জেঃ ডবলিউ অলপোর সাহেব দৃশ্যের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লন। শুনা যায় মৃতা নারীর বৌদ্ধমতাবলম্বিনী মাতার নিকট ইহার দেহের ভস্মাবশেষ প্রেরিত হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় আজ কাল অনেক শবদাহ হইতেছে।

প্রাণিরহস্য।

(১৫শ সংখ্যক।)

১। পরলোকগত কবিবর ব্রাউনিং প্রেমের সূত্রে একটী ভেকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ভেক বন্ধুর গর্ত্তের নিকট যাইয়া, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ধূলি বর্ষণ করিলেই সুহৃদ্‌বর প্রিয়তমের আগমন-সঙ্কেত লাভ করিয়া বহির্গমন করিতেন। কবি ভেকের মস্তকদেশে মৃদু শুড়শুড়ি প্রদান করিলে, ভেক প্রিয়তমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি পাত করিতেন এবং বারম্বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক হৃদয়ের আনন্দ ও প্রসন্নতা প্রকাশ করিতেন। ব্রাউনিং বন্ধুকে গৃহে আহ্বান করিলেই তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থুপ্ থুপ্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিতেন। বহুকাল তাঁহারা সুখে একত্র বাস করিয়া অবশেষে নিষ্ঠুর যমরাজ কর্ত্তৃক পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

২। নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ মানবের ভাষা বুঝিতে না পারিলেও, তাহারা

যে ভাব গ্রহণ করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদেরও ভাষা আছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক গার্ণার বানরগণের সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত জুন মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকাতে গার্ণার সাহেব এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম 'বানরের ভাষা'। ইহাতে প্রকাশ যে, তিনি 'ফনোগ্রাফ্' * যন্ত্রসহকারে বানরীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

তিনি মার্কিন দেশীয় "জাতীয় পশুশালা" হইতে এক দম্পতি বানরকে লইয়া পৃথক্ ২ স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং বানরীর সম্মুখে ফনোগ্রাফ্-যন্ত্র ধরিয়া তাহার শব্দকয়েকটী যন্ত্রস্থ করিলেন। উহা বানরের সম্মুখে আনিয়া খুলিয়া দেওয়াতে ঠিক্ পূর্ব্ব শব্দ বাহির হইল ও বানর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যন্ত্রমুখে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিল, কিন্তু কোথাও প্রেয়সীর নিদর্শন না পাইয়া বারম্বার ঔৎসুক্যের সহিত তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক এক বার দূরে যাইতে লাগিল, আবার আসিয়া যন্ত্রটী পরীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমাগত পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার সাহেব বানরীয় ভাষায় দুগ্ধের প্রতিশব্দ মুখস্থ করিয়া একটী বানরের নিকট উহা উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণেই বানর দুগ্ধপাত্র লইয়া পিঞ্জরের পার্শ্বে আসিল ও ঠিক্ সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। তৎপরে গার্ণার মহোদয় দুগ্ধ আনাইয়া বানরভ্রাতাকে পান করাইলেন। পানান্তে বানর উল্লাসের সহিত ৩।৪ বার সেই শব্দ উচ্চারণ করিল। গার্ণার দেখিলেন পিপাসা হইলেই বানর ঐ শব্দ উচ্চারণ করে; অতএব সেই শব্দ পানীয় তরল পদার্থবাচক বা পিপাসাবাচক সন্দেহ নাই।

ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা গার্ণার স্থির করিয়াছেন যে ক্ষুধাপ্রকাশক বা ভক্ষ্য বা কঠিন আহারবাচক একটী স্বতন্ত্র শব্দ আছে। এইরূপে গার্ণার হর্ষ বিষাদ, ভয় ও বিপদবাচক শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন। ভয়বাচক শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র শাখামৃগকুল অত্যুচ্চ স্থানে আরোহণ করে ও তিন চারি বার শব্দ শুনিলে ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে।

গার্ণার ৮।৯টী শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন। উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে ঐ ৮।৯টী হইতে উহার চতুর্গুণ শব্দ লাভ করা যায়। গার্ণার বলেন ভিন্ন ভিন্ন বানরজাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাষাভেদ আছে। এমনও হইতে পারে যে, তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, ঐ সকল ভিন্ন ভাষা তাহারই উপভাষা মাত্র।

* অর্থাৎ শব্দ মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্র, যাহার মধ্যে শব্দ ভরিয়া রাখা যায় এবং ঠিক্ সেই যন্ত্র ইচ্ছা মাত্র বাহির করা যায়।

৩। জন্তুদিগের মধ্যে উষ্ট্রেরা সাঁতার দিতে অক্ষম। তাহারা জলমধ্যে পড়িলেই উল্টাইয়া যায় এবং সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া জলমগ্ন হয়।

৪। কোন কোন জীব শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক আহার করে। মাকড়সা প্রত্যহ আপনার শরীরের ছাব্বিশ গুণ আহার উদরস্থ করে। শরীর সম্বন্ধে আহারের তুলনা করিলে মাকড়সার মত 'ঔদরিক' জগতে বোধ হয় আর নাই।

মুক্তিফৌজের জয়।

(৩১৮ সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারই নারীগণের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, পারিবারিক কর্ত্তব্য ব্যতীত জগতের সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে রমণীর হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নহে, শিক্ষিত সমাজেও অনেকের এইরূপ মত। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্‌ন (Canon Liddon) এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মুক্তিফৌজের প্রতি তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জনহিতৈষী ষ্টেড সাহেবের সহিত মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বার্ত্তা হইত। তাহাতে মুক্তিফৌজের প্রচার দেখিবার জন্ত তাঁহার কৌতূহল জন্মে। তিনি ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেষভাগে কোন এক শুক্রবার রাত্রিতে মুক্তিফৌজের একটী প্রার্থনা-সভায় গমন করেন। পাছে লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে, এজন্ত গাড়ী চড়িয়াই ক্যানন লিড্‌ন ধর্ম্মযাজকের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গলার সাদা কলারটী খুলিয়া রাখিলেন। ষ্টেড জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসকল খুলিয়া রাখিতেছেন যে ?"

ক্যানন লিড্‌ন উত্তর করিলেন, "দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ করিতেছি ভাবিবেন না; আমি মুক্তিফৌজের প্রার্থনা-সভায় আসিয়াছি শুনিলে কত লোকের কত প্রশ্ন ও প্রতিবাদ আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইবে। কিন্তু লোকের নিকট কৈফিয়ত দেওয়া বড় ক্লেশকর।" ক্যানন লিড্‌ন ষ্টেড সাহেবের সহিত যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। তাঁহারা গিয়া গ্যালারীর এক কোণে বসিলেন। অমনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অপর এক ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিড্‌নকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্ত সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ক্যানন লিডনের লুকাইয়া মুক্তিফৌজের কার্য্য দেখার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। যথা সময়ে সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পরিত্রাণের সাক্ষ্যদান প্রভৃতি আরম্ভ হইল। একটী মনোরমা

বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কদাকার পুরুষও সাক্ষ্যদান করিতে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত দিন লণ্ডনের কোন ষ্টীমারে কয়লা উঠাইয়া কয়লার রঙে সে অত্যন্ত বিকটাকৃতি হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ক্যানন লিড্‌ন তাঁহার বন্ধু ষ্টেড সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোককে ত আমরা কখনও সেণ্ট্‌পল গির্জার উপাসনায় দেখিতে পাই না!" ক্যানন লিড্‌ন মুক্তিফৌজের কার্য্য আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে গাড়ীতে চাপিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বন্ধু ষ্টেডকে বলিতে লাগিলেন;—

"আজ লজ্জায় আমার মুখ অবনত হইতেছে আজ আর আপনাকে বিকার না দিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। এই ত কতকগুলি অজ্ঞ দরিদ্র লোক, ইহাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা কি করিতেছি? আমাদের শিক্ষায় ধিক্‌ আমাদের উচ্চপদে ধিক্, আমাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না"।

মহাত্মা ষ্টেড আর এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"বিংশ বৎসর যাবৎ সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুবিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠতম নরনারীগণের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, জ্ঞানী ও কর্ম্মী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নরনারীগণের সম্বন্ধে আমার অল্লাধিক পরিমাণে কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু মানসিক শক্তি, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও কোন কিছু গড়িয়া পিটিয়া তুলিবার ক্ষমতাতে জেনারল বুথ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় আমার সমস্ত পরিচিত লোকের মধ্যে ৫ জন লোকও দেখিতে পাই নাই।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদের অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও কার্য্যদক্ষতা বলে অনেক মহৎ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহৎব্রত পালনের জন্য একটী পরিবার গঠন করার দৃষ্টান্ত একমাত্র জেনারেল বুথই দেখাইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য বলিয়া যে মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য এমন আশ্চর্য্য একটী পরিবার গঠন করিয়াছেন, দেখিলেই তাহাতে বুথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যুগ-যুগান্তর তপস্যার ফলে
পেয়েছিলে যেই অমূল্য রতন,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে জননী!
কে আছে দুখিনী তোমার মতন? ১

চন্দ্রহীন আজ ভারত আকাশ,
দুঃখ অমানিশা দিগন্ত প্রসার!
শোকেতে মগন সমগ্র ভারত—
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার। ২

'রত্নগর্ভা' নাম পেয়েছ জননী
যে রতন গর্ভে করিয়ে ধারণ,—
সে অমূল্য নিধি কেড়েনিছে কাল,
শূন্য করি বুক না মানি বারণ। ৩

কাঁদিতে এসেছ—কাঁদ চিরকাল
সোণার চাঁদেরা—র'লনা কেউ!
একে একে তাঁরা ছাড়ি গেলা মায়,
গণিছ কেবলি দুঃখের ঢেউ। ৪

উপাধি তোমার—'বিদ্যার সাগর'
দয়ার সাগর বাস্তবিক তুমি!
জীবনের ব্রত—পর উপকার ;—
ভুলিবেনা কভু ভারত ভূমি। ৫

বাল-বিধবার বাপের অধিক—
গরীব দুঃখীর সহায় সম্বল,
স্বদেশের হিতে সদা প্রাণপণ,
কামনা কেবলি দেশের মঙ্গল। ৬

সাহিত্য-সমাজে অগ্রণী সবার!
মৃত বঙ্গভাষা—দিলে তারে প্রাণ,
সকলের নেতা সমাজ সংস্কারে,
তব ঋণে ঋণী ভারত সন্তান। ৭

আড়ম্বর-হীন অশনে বসনে,
আচরণে যেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী,
আলাপনে তাঁর কিবা শিষ্টাচার,
মধুর ব্যাভার যাই বলিহারি। ৮

দেশের দুর্গতি করিয়ে স্মরণ
কতই যাতনা পেয়েছেন মনে,
নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন
করেছেন কত দেশের কারণে। ৯

নির্গুণে কিগুণ বলিবে তাঁহার?
একাধারে কার থাকে এত গুণ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দয়া মায়া স্নেহ
ফুটেছিল তাতে সমস্ত প্রসূন। ১০

যাও স্বর্গধামে—গুণের সাগর।
ওই দেখ মায়—অমৃত ভবনে
নিয়ে যাবে তাই বাহু প্রসারণ
করেছেন আজ তোমারি কারণে। ১১

রতন-খচিত স্বর্ণ সিংহাসন
শূন্য রহিয়াছে দেবতা সমাজে,
পূরণ করগে ওহে গুভাজন—
হেন সিংহাসন আর কারে সাজে? ১২

কাঁদিওনা আর—ভারত জননী,
সুরপুরে দেখ আনন্দ অপার!
দেবতারা মিলে করিছে উৎসব,
তুমি কেন তবে ফেল অশ্রুধার? ১৩

স্বর্গে গেছে সুত সাধি দেশহিত!
এ হ'তে কি সুখ আছে জননীর!
বীর-মাতা বলি দেও পরিচয়,
ধন্যা হও গর্ভে ধরি হেন বীর। ১৪ চ.

নূতন সংবাদ।

১। পুটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী জেলার দরিদ্র লোকদিগের জলপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য কূপখননার্থ ৪৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মগণ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীনিবাস নামে যে দুইটী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, অল্পদিন

মধ্যে সেই দুইটীরই শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৮০ এবং ছাত্রী-নিবাসে প্রায় ২৫ হইয়াছে। উভয়েরই কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

৩। বঙ্গমাতা দুইটী অমূল্য রত্ন এককালে হারাইয়া অতল শোক সাগরে নিমগ্ন!! গত ২৬এ জুলাই রবিবার রাত্রি ৯টার সময় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান, এবং সাহিত্য সংসারে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ইঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৮এ জুলাই মঙ্গলবার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণান্বিত, দয়ার অবতার ও প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ আদর্শ বঙ্গসন্তান ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির পিতৃস্থানীয় হইয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান কি আর পূর্ণ হইবে?

৪। বোম্বাই হইতে ৩২টী ভারত মহিলা অহিফেন ব্যবসা নির্ম্মূল করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় খৃষ্টান রমণীদিগের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলারাও এ শুভানুষ্ঠানে যোগদান করুন।

বামারচনা।

শোকাতুরা মা।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।)

১

উহহ রে বাপধন!
ভেঙে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা, কেন হেন খেলি,
তুই আঁচলের হীরা,
মাথা খোঁড়া—বুক চিরা,
কাঙালিনী মা'রে ফেলে কার কাছে গেলি?

২

ভিক্ষা মেগে দুটো খাই,
তা'য় কোন দুঃখ নাই,
ভুলে আছি সব ব্যথা তোরি মুখ চেয়ে;
তোর "মা" বলিয়া হায়,
আজো লোকে ফিরে চায়,
সকলে আমারে বলে 'ভাগ্যবতী মেয়ে'!!

৩

জানেন অন্তরযামী,
বড় অভাগিনী আমি,
অমূল রতন তুই বুক পূরাবার;
অভাগী মায়ের তরে,
চাঁদ মুখে কথা ক'রে,
"মা"বলিয়া ডাক্ বাছা, আর একবার।

৪

তুই যে "করুণাসিন্ধু"
"দীন কাঙ্গালের বন্ধু"
কেমনে ছাড়িয়া যা'স কাঙ্গালিনী মা'রে,
বোঝ না কি হায় তুমি,
আমি দীনা—বঙ্গভূমি,
তোমা বিনা বাপ ধন, বুকে নেব কারে?

৫

থেটে থেটে রাত দিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছ শুয়ে অলস হইয়া ?—
অভাগী মায়ের লাগি,
সারা রাতি জাগি জাগি,
আজি কি এমন শুয়ে পড়েছ ঘুমিয়া ?

৬

ওঠ যাদু, কথা কও,
তুমি তো "অবাধ্য" নও,
জগতে তোমার নাম "মাতৃভক্ত ছেলে" ;
মায়ে তোর বড় টান,
মায়ে মাথা তোরি প্রাণ,
চাও না স্বরগ তুমি মা'র কোল পেলে !

৭

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিলাসের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না,
শুধুই আমারি তরে,
খাটিছ সহস্র করে,
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনা।

৮

দুরন্ত বালক গুলো,
চোখে দিয়ে আছে ধূলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা ?
কেউ দেয় গালাগালি,
কেউ দেয় করতালি,
কোন আহম্মক হায় হেসে হয় সারা !

৯

দেখে সেই নিঠুরতা
পরাণে লেগেছে ব্যথা,
তাই কি আমার প'রে রাগ করে যাও ?—
কভু তো শোন না তুমি,
পাগলের পাগলামি,
এস কোলে যাদুমণি, মা'র মাথা খাও।

১০

তোমারে হইলে হীন,
মরিবে কাঙ্গাল দীন,
মরম-বেদনা তারা কার কাছে ক'বে,
কেবা সে আপনা দিয়ে,
দিবে অশ্রু মুছাইয়ে,
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ব'বে !

১১

মেয়ে গুলো অবিরত,
আজিও কাঁদিছে কত,
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা,
আজো, "সতীনের ঘর"
"কচি মেয়ে বুড় বর"
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১২

তোমারে রয়েছে চেয়ে,
বালিকা বিধবা মেয়ে—
আপন কর্ত্তব্যে তুমি কবে কর হেলা—
তাদের যে কেউ নাই,
তুমি বাপ তুমি ভাই,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৩

আজিও সে "রুচিদোষ"
আজো কত "আপশোষ"
আজিও শ্মশানে ভূত পিশাচের মেলা ;
কও তাই চাঁদ মুখে,
ঘুমায়ে র'লে কি সুখে,
এই কি তোমার যাদু, ঘুমা'বার বেলা ?

১৪

তুমি না থাকিলে বুকে,
অভাগী কি পোড়ামুখে,
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ?—
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় বাছ কোলে আয়!
লুকায়ে রাখিগে' তোরে শত বুক চিরে!

১৫

মরি! মরি! ধাপধন!
ছিঁড়ে টুটে গেল মন,
তো'হেন পুত্রের শোক কার কবে স'য় ?
তোমারে হইয়ে হারা,
কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগত সারা, আমি একা নয়!

১৬

নিঠুর শ্রাবণ মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ,
আঁধারে ডুবালি মোর সরবস্ব ধন,
হৃদি-পিণ্ড করে চুর,
কেড়ে নিলি কোহিনুর,
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন!

১৭

ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে!—
উহ, কি দেখিনু চক্ষে,
চন্দনের কাঠে কা'রা চিতা সাজাইলি ?—
হোক্ ধরা ছাই ভস্ম,
——কাঙ্গালের সরবস্ব,
জলন্ত অনল মাঝে কোন্ প্রাণে দিলি ?

১৮

ও দেহ—সোণার দেহ,
দি'সনে চিতায় কেহ,
অভাগীর সুখ সাধে দি'সনে আগুন;
অন্ধের হাতের নড়ি,
নি'সনে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবিরে খুন !!

১৯

সহস্র মরণে হায়,
ভাঙিব পায়ের ঘা'য়,
সহস্র গঙ্গার জলে নিভাইব চিতে;
আনিয়া অমৃত-বায়ু,
দিব কোটী পরমায়ু,
আমার সোণার চাঁদে, কে আসিবি নিতে !!

২০

অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে,
উথলি উঠেছ গঙ্গে!.
তুমি কি পবিত্র হবে "ঈশ্বরে" পরশি,
স্বরগে দেবতা তা'য়,
ডাকিছে কি "আয় আয়!"
পাতিয়া রতনাসন তা'রা আছে বসি ?

২১

যেথানে নারদ, ব্যাস,
জনকাদি করে বাস,
আমার বাছারে কি গো সেথা নিয়ে যাবি ?
ঈশ্বরে "ঈশ্বর" দিয়া,
দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবার অমর করাবি ?

২২

তবে বাবা দেব-বেশে,
যাও চলি দেব-দেশে—
মরণের পরপার—অনন্ত যথায়!
আজ দশ দিক্ ভরি,
বল্ তোরা হরি হরি,
আমার ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্গপুরে যায় !!

* * *

কবি যে আপনা হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা, পরাণ, সব হয়ে গেল জল,
বিদ্যাসাগরেরে মাগো! কেন দিলি বল্ ?

শ্রীমা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৯৮—আগষ্ট ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠনিবাস—বৈদ্যনাথে দেবতার বরে আরোগ্য হইবার জন্য অনেক দরিদ্র কুষ্ঠ রোগীর সমাগম হয়, কিন্তু বাসস্থান, আহার, পানীয় জল ও বস্ত্রের অভাবে তাহাদের যে দুরবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ বাবু রাজনারায়ণ বসু কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলিতেছেন, এবিষয়ে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের যথাসাধ্য সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গনিবাসীর মোকর্দ্দমা—কয়েক মাস হইল বঙ্গনিবাসী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম সাধারণের উপর অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করেন এবং বিশেষ ভাবে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্র আক্রমণ করেন। আদালতের বিচারে পত্রাধ্যক্ষের ১০০৲ টাকা জরিমানা ও ৬ মাস মেয়াদ, প্রকাশকের ৩ মাস মেয়াদ এবং প্রিণ্টারের ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আমরা এজন্য দুঃখিত, বিশেষতঃ পত্রাধ্যক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারাদি দ্বারা সমাজের যেরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশকগণ আপনাদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ভদ্রপরিবার ও স্ত্রীলোকদিগেরও মিথ্যা-গ্লানি অবাধে প্রচার করিবেন, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্গনিবাসীর বিরুদ্ধে ৩টী অপরাধ সাব্যস্ত হয়, একটীর জন্য এই দণ্ড হইয়াছে, বাদীরা আর ২টীর দণ্ড হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

সমাজ সংস্কার—জয়পুর ও ভাউ নগরের রাজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মতি আইন স্ব স্ব রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের অধিকার—যুক্তরাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার বিধিবদ্ধ হইতেছে—কানসাস প্রতিনিধি সভা প্রায় একবাক্যে "স্ত্রীলোকদিগের পূর্ণ অধিকারের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। উইসকনসিন প্রতিনিধি সভা অধিকাংশের মতে স্থির করিয়াছেন, বিবাহিতা রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা উকীল, তাঁহারা কোর্ট কমিসনর ও আসাইনীর কার্য্য করিতে পারিবেন। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের ওকালতী করিবার ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বেই ছিল। মিসোরী প্রতিনিধি সভায় বিদ্যালয়ের মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য এক বিল উপস্থিত হইয়াছে।

নবীন সন্ন্যাসিনী—"বাল্‌টিমোর সন" সংবাদপত্র সম্পাদকের কন্যা কুমারী এবেল সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রোমান্ ক্যাথলিক চর্চ্চে উৎসর্গীকৃত হইবে।

মার্কিন দীপমক্ষিকা—ইহা ১ বুরুলের অধিক দীর্ঘ এবং ইহার শরীর দেখিতে জ্বলন্ত মণির ন্যায়। তত্রত্য রমণীরা নৃত্য করিবার সময় অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই জোনাকি পোকা দ্বারা কেশ ও বস্ত্র ভূষিত করেন, দেখিতে চমৎকার হয়। মণ্টি য়েলের প্রথম ফরাসী উপনিবেশীরা বেদীর সম্মুখে বর্ত্তিকার পরিবর্ত্তে এই দীপমক্ষিকা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিতেন।

ইউরোপে শবদাহ—ইংলণ্ডে শবের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ হইতেছে, আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে এক পারিস নগরে ৬৩৮৮টী দাহকার্য্য হইয়াছে।

লেডী ইলিয়টের সৌজন্য—কলিকাতার কোন কোন কলেজের ছাত্রগণকে লইয়া ছোট লাট বোটে করিয়া ভ্রমণ ও তাহাদের সহিত বিশেষ আলাপ করেন। ছোট লাটপত্নী এবিষয়ে সহকারিতা করিয়াছেন।

বানরের ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার ফনোগ্রাফ দ্বারা বানরের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কালে আরও কতই হইবে!

ভারত ভগিনী—লাহোর হইতে হিন্দী ভাষায় এই নামে একখানি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বিলাত প্রত্যাগত সুশিক্ষিতা হরদেবী ইহার সম্পাদিকা। ইহাতে সাহিত্য, সমাজসংস্কার, নীতি ও ধর্ম্ম নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিত হয়। আমরা ভগিনীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আর্য্য-মহিলা।

সাবিত্রী।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।"

আজ ভারতভূমি যাহাই হউক, একদিন অতুল কীর্ত্তিমন্দির ছিল। আজ ভারতকে বিদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, একদিন ভারতই লোক-শিক্ষায় অদ্বিতীয় ছিল। এই ভারতে এক-দিন এক দেবাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একদিন ভারতের নাম চিরস্মরণীয় করিতে এক অপূর্ব্ব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, —সে অনেক দিনের কথা, আজ আর সে দেবী ভারতে নাই, ভারতের অণু পরমাণু খুঁজিলেও তাঁহার শেষ চিহ্ন পাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার অমৃত কিরণে ভারতবক্ষ অমৃতময় হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র নাম, মৃত সঞ্জীবন নাম, ভারতের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে; বুঝি ভারতবাসীর মলিন প্রাণ—নির্জ্জীব প্রাণ পবিত্র ও জীবন্ত করিতেছে। সেই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নাম সাবিত্রী। "সাবিত্রী সমানা হও" ইহাই ভারত রমণীর শ্রেষ্ঠ-তম আশীর্ব্বাচন। যেমন একাক্ষরের উচ্চারণে পরম ব্রহ্মের অনন্ত নাম বুঝায়, সেইরূপ "সাবিত্রী সমানা হও" বলিলেই আশীর্ব্বাদপাত্রীকে "জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিতা হও, ভক্তি প্রীতি রক্ষার্থে সুকুমারী হও, ধর্ম্ম রক্ষার্থে তেজস্বিনী হও, আদর্শ পতিপ্রাণা হও, স্বামীর সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বমঙ্গলা, মৃত্যুভয়নাশিনী হও, সুতরাং বৈধব্যাবস্থার অতীত হও" ইত্যাদি শুভময়ী হইতে বলা হয়। আর্য্য জাতির বিশ্বাস, যিনি সাবিত্রী ব্রত করিতে পারেন, সে রমণী কখনই বিধবা হন না। তাই তোমাদিগকে ডাকিতেছি, ভগিনীগণ আইস, সকলে মিলিয়া সেই অমরকীর্ত্তি রমণীর অমৃতময় নাম কীর্ত্তন করিব। আমরা অক্ষম হই, দুর্ব্বল হই, অণু হই আর পরমাণু হই, অমৃতে অরুচি হইবে কেন?

সাবিত্রী অশ্বপতি রাজার একমাত্র কন্যা। অশ্বপতির বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তাঁহাকে একজন বহু-গুণান্বিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কন্যার নামকরণেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাবিত্রী অর্থে "ভার্য্যাগণ জনয়িত্রী, সূর্য্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভবানী, গায়ত্রী" ইত্যাদি সুপবিত্র অর্থগুলি নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কন্যাকে যেরূপে সুশিক্ষিতা করেন, তাহাতে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এ নীতি বাক্যের সার্থকতা দেখা যায়।

শত উপদেশের অপেক্ষা, একমাত্র সাধুদৃষ্টান্তের অধিক কার্য্যকরী শক্তি, এই মনে করিয়াই পিতা সাবিত্রীকে

পবিত্র ও শান্তিময় স্থানে যাইতে আদেশ দিতেন। যেখানে দুর্জ্জনের ভয় আছে, একবিন্দু পাপেরও সংস্রব আছে, সেখানে অবলার পক্ষে অবরোধপ্রথা প্রার্থনীয়। আর যেখানে পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে, দেবতার অভয় আছে, সেখানে রমণী মুক্ত। কিন্তু অভিভাবকেরা এইরূপ ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক ইহা বুঝেন না। "আমোদ" বলিয়া পুরবাসিনীগণকে নরকের চিত্র দেখাইতেও সঙ্কুচিত হন না, আবার 'লোকে- কি বলিবে" ভাবিয়া পবিত্র স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে সাহসী হন না! নানা কারণে আমাদের ঘরগুলি এমন হইয়াছে। তাই, বাঙ্গালির মেয়েগুলির কপাল, এক আগুনে পোড়ে নাই!

যাহা হউক, সাবিত্রীর কথা বলিতেছিলাম—সাবিত্রী অনেক সময়ে তপোবনে যাতায়াত করিতেন। সেখানে বনজাত তরুলতার শ্যামল ছটা দেখিয়া, নব বিকশিত কুসুমকুলের শোভা ও সুগন্ধ পাইয়া, বৃক্ষশাখাসীন বিহগগণের মধুর কাকলী শুনিয়া পরম প্রীত হইতেন। তপস্বীদিগের পালিত মৃগশিশু এবং অন্যান্য নিরীহ পশু যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেছে; ক্ষীণ তটিনী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে; প্রকৃতির সেই রমণীয় উপবনে, প্রকৃতি দেবী সরলা বালিকা হইয়া পবিত্রতা শিক্ষা করিতেছেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজ-পুর-বাসিনী সাবিত্রীর হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। তপোবন পুণ্যময়; তাই তাপস তাপসী দিগের ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ, পরহিতৈষণা প্রভৃতি দেখিয়া সাবিত্রী-হৃদয় বিগলিত হইত। সাধুতার প্রতি একান্ত টান হইলে তাহার কিছু না কিছু আয়ত্ত হইয়াই থাকে; বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ জীবনের অমৃতস্বরূপ। সাধু সঙ্গের গুণেই রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি মুনি; জগাই মাধাই দুর্ব্বৃত্ত, নরদেবতা; শবরী, দেবী। তাই হিন্দু শাস্ত্রে সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ আছে। তাই আমাদের পবিত্র-হৃদয়া সরলস্বভাবা, সুশিক্ষা-প্রাপ্তা সাবিত্রী তরুণ বয়সে, সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে এক অলৌকিক, দেবী জীবন লাভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অবন্তীরাজ দ্যুমসেন, অন্ধ ও শত্রুদিগের কৌশলে রাজ্যভ্রষ্ট হন। উপায়ান্তর অভাবে নিজ সহধর্ম্মিণী এবং একমাত্র বালক পুত্র সত্যবানকে লইয়া তপোবনে বাস করেন। দ্যুমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার কার্য্য বুঝিবে কাহার সাধ্য? মানুষে যাহা বিশেষ অকল্যাণকর মনে করে, তাহা হইতেই হয়তো তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। রাজা দ্যুমসেন চক্ষু ও রাজ্য হারাইয়া যাহা লাভ করিলেন, তাহা দেবতার লোভনীয়। রাজভব-

নের কূট শিক্ষায়, সম্পদের আসুরী উত্তেজনায় এবং চাটুকারদিগের আপাত-মধুর স্তুতি বাদে, অনেক দেব চরিত্র—তরুণ বয়সে রাক্ষস চরিত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজা দমসেনের স্নেহের ধন সত্যবান্, বালক বয়সে পর্ণ কুটীরে থাকিয়া, ব্রহ্মপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয় তপস্বীদিগের শিক্ষা ও সাহচর্য্য পাইয়া, আজন্মশুদ্ধ এক আদর্শ জীবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা দমসেনের "গরলে অমৃত" হইল।

আগে বলিয়াছি অশ্বপতি-তনয়া সাবিত্রীদেবী তপোবনভ্রমণে যাইতেন। এইখানে সাবিত্রী সত্যবানে শুভ সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের গুণ বুঝিলেন। বুঝিলেন উভয়ে উভয়ের হইতে পারিলেই জীবন সফল হইবে। কিন্তু সে হৃদয় যুগল, দুর্ব্বল হৃদয় নয়; সে হৃদয় যুগল ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গীকৃত, তাই অনুরাগের আকর্ষণ বিশেষ প্রবল হইলেও সে হৃদয়-দ্বয় শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিল না, উভয়ে উভয়কে মনের কথা জানিতে দিল না। সেই বয়সে এমন বিজ্ঞতা, এমন পরিণাম-দর্শিতা, এমন সংযত-চিত্ততা সাধারণ মস্তিষ্কের ও সাধারণ চরিত্রের ক্রিয়া হইতে পারে না।

সত্যবান্ নিজের আকাঙ্ক্ষাকে "দুরাকাঙ্ক্ষা" মনে করিলেন। সত্যবান্ আশ্রয়হীন,রাজকুমারী কি তাঁহার দুর্ভাগ্য-সহচরী হইতে পারেন? সত্যবান্, সে রমণীরত্ন গ্রহণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে পারেন সত্য, কিন্তু সুকু-মারী রাজবালাকে বনবাসিনী করিবেন কি করিয়া? তাঁহার মত "অপাত্র"কে সাবিত্রীদেবী পতিত্বে বরণ করিবেনই বা কেন? এই সকল মনে করিয়াই সত্যবান্ মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল, মনের কথা প্রকাশ করিলেও সত্যবানকে নিন্দিত বলা যাইত না। এইখানেই আমরা সত্যবানের কর্ত্তব্য বোধ—সত্য-বানের আত্মসংযমের বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। এ যদি চোখের ভালবাসা হইত, এ যদি দুষ্মন্ত রাজার অনুরাগের ঝোঁক হইত, তাহা হইলে সত্যবান্ এত ভাবিবার অবকাশ পাইতেন না।

সাবিত্রীর সেরূপ প্রতিবন্ধকতা ঘটিল না। সাবিত্রী বুঝিলেন সত্য-বানের মত নর দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই সাবিত্রী-জীবন ধন্য হইবে। সত্যবান্ যাহার স্বামী, তাহার বনবাস, স্বর্গবাস। সাবিত্রী জানেন, বিবাহ বাণিজ্য ব্যবসায় নহে। সাবিত্রী জানেন, ধন গৌরব, পদ মর্য্যাদা প্রভৃতি পার্থিব জিনিসের উদ্দেশ্যে যে বিবাহ, সে বিবাহ বিবাহই নহে। সাবিত্রী জানেন, বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রীর উভয় আত্মা একত্রে যোগ করা, সেই মিলিত, সেই দুয়ে এক আত্মা, পরমাত্মায় সমর্পণ করা। এই সকল নিগূঢ় রহস্য জানেন বলিয়াই সাবিত্রী, সত্যবানের

অজ্ঞাতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন; সাবিত্রীর পবিত্র হৃদয় মন্দিরে, পবিত্র দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল। এখন সামাজিক সম্প্রদানের কর্ত্তা পিতা।

মাতা সাবিত্রীর এই "অপরিণামদর্শিতায় দুঃখিত হইলেন।" তাঁহার স্নেহের সাবিত্রী, রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা হইবেন, রাজভবনের ভোগ বিলাসে "পরম সুখী" হইবেন, এখন রাজকুমারী পরে রাজ-বধূ হইবেন, তাহা হইলেই মা'র সকল সাধ পূর্ণ হয়। সাবিত্রী রাজকুমারী; সাবিত্রী তপস্বিনী হইয়া বনে বনে ফিরিবে, যাহার সেবা শুশ্রূষার জন্যে শত শত পরিচারিকা রহিয়াছে, সে আবার অন্যের পরিচর্য্যা করিবে, যাহার জন্য কত রাজভোগ প্রস্তুত হয়, সে আবার বনজাত ফলমূল খাইবে, ইহা স্নেহময়ী মায়ের প্রাণে সহিতেই পারে না। মা সাবিত্রীকে অনেক বুঝাইয়া এ "ভীষণ কামনা" পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু মা'র অনুনয় বিনয়, সবই নিষ্ফল হইল। স্রোতের মুখের তৃণের ন্যায় সবই ভাসিয়া গেল। মাতৃ-ভক্তির অনুরোধে আর সবই পারা যায়, কেবল ধর্ম্মকে অবমাননা করিতে পারা যায় না। তাই সাবিত্রী মায়ের অন্যায় কথা রাখিতে পারিলেন না। আহা, মা! তুমিতো জান না তোমার সাবিত্রী তোমার গর্ভ পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী, ভারতভূমিকে "পুণ্যময়ী" করিতে আসিয়াছেন! আর তুমিতো জাননা তোমার সাবিত্রী বসুমতীকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন! জান না বলিয়াই কাঁদিতেছ, জানিলে কতই হাসিতে!

সাবিত্রীর সঙ্কল্প, তাঁহার পিতার শ্রুতিগোচর হইল। গান্ধারী দেবীর পিতা আপনার স্বার্থের মন্দিরে কন্যা বলি দিয়াছিলেন, সাবিত্রী দেবীর পিতা কোনও সময়ে পিতৃ-কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেন নাই। "অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাং" এ নীতি আমরা সাবিত্রীর পিতাকে পালন করিতে দেখিয়াছি। আবার এখন তিনি মনে করিলেন "সাবিত্রী যতই ধর্ম্মশীলা হউন, যতই জ্ঞানবতী হউন, তথাপি বালিকা।* বালিকার অভিপ্রায়ানুসারে অজ্ঞাত কুলশীল, অজানিত চরিত্র সত্যবানকে সহসা কন্যাদান করিতে হইলে হয়তো ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হইবে।" তাই তিনি সত্যবানের পরিচয় পাইতেই বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। আজ কাল দেশের নব্য স্বাধীনতাবাদী যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু সাবিত্রীজনকের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

এই আন্দোলনের সময়ে দেবর্ষি নারদ, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ

* অবশ্য দশম বর্ষীয় বালিকা নহে।

আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার স্নেহের সাবিত্রীর অভিলষিত পাত্র সত্যবানের পরিচয় সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষি সত্যবানের পরিচয় ও সদ্গুণ সকল বর্ণনা করিলেন। রাজা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজা গুণের মর্য্যাদা জানেন। ধনবান্ পাত্র অপেক্ষা গুণবান্ পাত্রে কন্যাদান করাই পিতার গৌরব। কিন্তু দেবর্ষি সত্যবানের কথা শেষ করিয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৎসে! সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তাও কি হয়? দেবতাকে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া কি ফিরাইয়া পাওয়া যায়? দেবর্ষি, গার্হস্থ ধর্ম্মহীন ভগবৎ-সাধক, তাই বুঝি জগতের শিক্ষক হইয়াও সাবিত্রী হৃদয় বুঝিলেন না। সাবিত্রী যে মরজগতে বিশ্ববিধাতার প্রেমপ্রতিমা, তাহা জানিলেন না।

সাবিত্রী কর-যোড়ে উত্তর করিলেন, "দেব, যাঁহাকে একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িলে আমি ধর্ম্মতঃ পতিতা হইব। অতএব আমার প্রতি সেরূপ আদেশ করিবেন না।" সেই বিনীতা অথচ তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, দেবর্ষি প্রীতও হইলেন, বিস্মিতও হইলেন। বালিকাতে এতই ধর্ম্মভাব, এতই অনুরাগ! যাহা হউক তথাপি আবার বলিলেন "বৎসে! তুমি সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া অপর কোনও সুপাত্রকে পতিত্বে বরণ কর।"

তখন সাবিত্রী দেবী দৃঢ় অথচ কোমল স্বরে উত্তর করিলেন "যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করা যায়, তিনিই প্রকৃত পতি। আমি জগদীশ্বরের সাক্ষাতে যাঁহাকে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তাঁহার যে কোন অযোগ্যতাই থাকুক, তিনিই আমার স্বামী। তিনি আমার অত্যাজ্য।"

এইখানে পাঠিকা, সাবিত্রীর হৃদয়ের বল দেখ! সত্যবান্ কিসে অবরণীয়, তাহা জানিতে সাবিত্রীর আকাঙ্ক্ষা নাই। যে সকল সদ্গুণ থাকিলে, সাবিত্রী স্বামী বলিয়া পূজা করিতে পারেন, সত্যবান্ সেই সকল গুণে ভূষিত। সাবিত্রী সত্যবানকে জানিয়াই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। যখন পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ যাহাই হউন, সাবিত্রী তাঁহারই অনুরক্ত। জগতে এমন ঘটনা কি আছে, যে সতী পতি ত্যাগ করিতে চাহিবে? যদি একদিন পর্ব্বত-শৃঙ্গের পতন সম্ভাবিত হয়, তথাপি সতীর হৃদয় পতিচ্যুত হইবে না। এ কথা কোথায় শিখিলাম? শিখিলাম, সাবিত্রী দেবীর কাছে। দেবর্ষির এত আগ্রহ, তথাপি সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেন না সত্যবানকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে বাধা কি? সে কথা সাবিত্রীর অনাবশ্যক। সাবিত্রী কেবল সত্যবানেরই! ইহারই নাম পাতিব্রত্য!!

যাহা হউক উভয়ের বাদানুবাদ

শুনিয়া রাজা যেরূপ বিস্মিত হইলেন, সেইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সত্যবান্ সুপাত্র, ধনের জন্য দেবর্ষি কখনই আপত্তি করিবেন না। এরূপ স্থলে পুনঃ পুনঃ নিষেধের কারণ জানিবার জন্য রাজা একান্ত অস্থির হইলেন এবং দেবর্ষিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীর একাগ্রতা দেখিয়া ও রাজার মিনতি শুনিয়া দেবর্ষি যাহা গোপন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে বাধ্য হইলেন।—বলিলেন "সত্যবান্, সর্ব্বাংশে সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইলেও অল্পায়ু, অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে।"* এই কথা শুনিয়া রাজার হৃদয় বজ্রাহত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তবে সত্যবান্কে কন্যা দান করা আমার অকর্ত্তব্য। সাবিত্রী বালিকা, বালিকা-কৃত কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না।"

যে বালিকার মঙ্গলের জন্য এই সকল কথা হইতেছিল, সে বালিকা কিন্তু এখনও তাহার অটল স্থিরতা হারাইল না! অই নবস্ফুট কুসুমে এতই জীবনীশক্তি যে বজ্রাঘাতেও তাহা শুকাইল না। দীনতাও তুচ্ছ কথা, হীনতাও তুচ্ছ কথা, পতিব্রতার প্রতিমা সাবিত্রীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়তা, এতই বীরত্ব যে দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অকাল বৈধব্যের ভয়েও সে প্রাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। তখনও সাবিত্রী অবিচলিত ভাবে বলিলেন "জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই। তাই বলিয়াই কি মৃত্যু-ভয়ে অধর্ম্মাচরণ করিব? আমি যাঁহাকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি যাহাই হউন, তিনি আমার স্বামী!" যেন সাবিত্রী এই কথা বলিতে চান, "বৈধব্যের ভয়ে সত্যবান্কে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করিব, সে ও তো মরিতে পারে! মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, তখন অধর্ম্ম করিব কিসের লোভে?"

ধন্য সাবিত্রী! স্বামীর জন্য রমণীকে অনেক করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাবস্থা উপেক্ষা করিতে দেখি নাই! যে যাতনা-ভয়ে কত শত রমণী, স্বামীর চিতায় পাড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, সেই অব্যক্ত অসহ্য যাতনা, সাধিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া তরুণ বয়সে "বৈধব্য" চাহিয়া লইতে এই প্রথম দেখিলাম, বুঝি এই শেষ দেখিলাম! এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, এমন অনুরাগ, এমন সাহস আর কোথায় দেখিব? স্বদেশে যাও, বিদেশে যাও-

---

* শরীরবিজ্ঞানে, ক্ষয়, যক্ষা, হৃদ্রোগ (প্রভৃতি) গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট সময় জানা যায়। যাঁহারা জন্মকোষ্ঠী অথবা দেবর্ষির ভবিষ্যৎ জ্ঞান, বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা সত্যবান্কে ঐরূপ কোন রোগগ্রস্ত মনে করিলেই করিতে পারেন। এখানে আমাদের মতামত অনাবশ্যক।

হীরা পাইবে, মুক্তা পাইবে, শকুন্তলা ডেস্‌ডিমোনা পাইবে, কিন্তু সাবিত্রী আর পাইবে না! বিধাতার প্রেমপ্রতিমা, মরজগতের "মহাশক্তি," আবার ভারতে দেখিব কি?—কও মা, বিশ্বজননী! আর একবার দেখাইবে কি?

এই বারে দেবর্ষি, সব বুঝিলেন। যিনি স্রষ্টৃ-তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে তাঁর কতটুকু সময় লাগে? দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী-হৃদয় কিরূপ উপকরণে গঠিত হইয়াছে। দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রী হৃদয়ে কোন্ বৃত্তি গুলি অনুশীলিত হইতেছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, সাবিত্রীর প্রাণ কাহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে! দেবর্ষি বুঝিলেন, কেন সাবিত্রী-হৃদয় যুগপৎ—"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি!" বুঝিয়া বলিলেন, মা! তুমি কখনই বিধবা হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি এ বিবাহ শুভময় হউক।"

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রী সত্যবানে বিবাহিত করিলেন। সাবিত্রী পরমানন্দে পিতৃভবন সুখময় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দারিদ্র্যময় স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিতে গেলেন। সাবিত্রী যেমন সেবা-পরায়ণা, ভক্তিপরায়ণা, সেইরূপ গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা। শ্বশুর শাশুড়ী সাবিত্রীকে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। প্রতিবাসী তাপস তাপসীরা সাবিত্রীর গুণে মুগ্ধ হইলেন। সাবিত্রীর নৈপুণ্যে সেই পর্ণকুটীরও রাজ-সংসারের ন্যায় "অভাবহীন" হইল। যে মেয়ে গৃহধর্ম্মে অমনোযোগিনী—ছি! তার হাতে সোণার সংসারও "টানাটানি" ভরা।

যে কোন জিনিস—অমূল্যই অতুল্যই হউক, যে কোন জিনিস চিরদিন প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার আশা থাকে, তাহার ততটা মর্য্যাদা বোঝা যায় না। গ্রীষ্মকালের দিনে নিত্যই সূর্য্যের আলোক, সূর্য্যালোকের মর্য্যাদা তখন বোঝা যায় না। তারপর বর্ষার সময় যত নিকটে আইসে, সূর্য্য যে কেমন পদার্থ, তাহা ততই হৃদয়ঙ্গম হয়। যখন মা'র কাছে থাকা যায়, তখন মা' যে কেমন জিনিস তাহা বোঝা যায় না, তারপর মা'র কাছছাড়া হইবার দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই মা'কে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে ইচ্ছা করে না। সত্যবানের উপরে সাবিত্রীর ভাল-বাসা এই রকম শক্তিতে বাড়িয়াছিল। সাবিত্রীর এত সাধনার দেবতা, সাবিত্রী দুদিন প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারিবেন না! সত্যবানকে—সেই উপাস্য দেবতাকে, সাবিত্রীর বিদায় দিতে হইবে! আর দিন কতক পরে সত্যবান্ এজগতে থাকিতে পারিবেন না! তাই সাবিত্রী—দিন ফুরাইয়া আসিতেছে বলিয়াই প্রাণ ভরিয়া, স্বামীকে ভাল বাসিয়া লইতেছেন,—নিজে ইচ্ছা করিয়া নয়, ইচ্ছা করিয়া ভালবাসা যায় না—কর্ত্তব্য পালন করা যায়। ভালবাসা, সব বুঝিয়াছে, এই কয়দিনের মধ্যে

তাহার সমস্ত কাজ করা চাই, তাই বুঝি সকল শক্তি একত্র করিয়া তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। তাই এই কয় দিনেই সাবিত্রী সত্যবান্‌গতপ্রাণ হইয়াছেন। সাবিত্রীর পতিই ধ্যান, পতিই ধারণা, পতিই যোগ, পতিই সাধনা হইয়াছে। ভালবাসার "ক্রমোন্নতি" স্বীকার করি, কিন্তু পথে কোন বাধা দেখিলে ভালবাসা যে অবক্তব্য ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে, একথা আরও স্বীকার করি। মা' যে রোগা সন্তানটীকে সকলের অপেক্ষা স্নেহ করেন, তাও এই কারণে। *

এইখানেও সাবিত্রীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়। আমরা জগতে দেখিতে পাই, মনে কোনও দুর্ভাবনা থাকিলে, মনে আত্মীয় স্বজনের অনিষ্টাশঙ্কা প্রবল হইলে, অনেক সময়ে মানুষ ধৈর্য্যহারা হইয়া যায়। সাবিত্রীদেবী প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা হৃদয়ে রাখিয়াও ধীরতা সহকারে সকল কর্ত্তব্য গুলিই পালন করিতেছেন—সে হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিতেছে না, সে প্রাণ যেন ভস্ম হইতেছে না! যেন কিছুই হইতেছে না! ধর্ম্ম, জ্ঞান, সাহস, সহিষ্ণুতা, পতিপ্রাণতা, গুরুভক্তি, গৃহিণীপণা, দৃঢ়চিত্ততা—আর আমরা কয়টাই বা জানি—কোন্‌টীর কি প্রশংসা করিতে হয়, তাহাও জানি না! তবে সাবিত্রী দেবীর সকল গুলিই সুন্দর, সকল গুলিই মধুর, সকল গুলিই—মনে হয়, এমন আর নাই!—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমন মনে করিওনা, সাবিত্রী দেবীর কোমলতা কিছু অল্প। কোমলতায় সাবিত্রী-হৃদয় নারীগণ হইতে—আমাদের বঙ্গবাসিনীগণ হইতে অন্যরূপ নহে। তবে মহাত্মা সক্রেটিশ যেমন স্বাভাবিক ক্রোধন প্রকৃতি হইয়াও অলৌকিক ক্ষমতা বলে ক্রোধকে সংযত করিতেন, আমাদের সাবিত্রী দেবীও সেইরূপ স্বভাবত কোমল-হৃদয়া হইয়াও এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন—রমণীর হৃদয়ে কোমলতা না থাকিলে, সে হৃদয়ের আর গৌরব কি?

(ক্রমশঃ)

---

* আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বলেন "সত্যবান্ সাবিত্রীতে ক'দিন দেখা শুনা হইয়াছিল যে এত অনুরাগ হইল?" শ্রদ্ধাস্পদ বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুও তাঁহার সমাজ চিন্তায় ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছেন—তাই (আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসে) অল্প সময়ের মধ্যে গভীর অনুরাগের কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

বাঃ বোঃ।

ধর্ম্মকথা।

দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দেয়। যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা আমাদিগেরই কার্য্যের ফল, তাহারই মধ্য দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দেন।

কোন সাধুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কোথায় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যেখানে আমি আমাকে হারাইয়াছি। আর যেখানে আমি আমাকে দেখিয়াছি, সেইখানে ঈশ্বরকে হারাইয়াছি।"

তোমার ঈশ্বর-ভক্তি কত বৃদ্ধি হইতেছে, ঈশ্বরের জন্য তুমি কত ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিতেছ, ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ পাইয়া কত সুখী হইতেছ, বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা লোকসমাজে বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের সহিত তোমার প্রেমের কথা, তুমি ও তোমার ঈশ্বর জানিলেই যথেষ্ট।

তুমি যত তোমার নিজের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে থাকিবে, ততই দেখিবে ঈশ্বর যেন তোমার নিকটতর হইতেছেন।

পবিত্র অন্তঃকরণ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পান। পবিত্রতার পূর্ণতা যাঁহাতে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে; অন্য উপায় নাই। পবিত্রতা লাভের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা যিনি ক্রমে পবিত্র হইতে থাকেন, সেই পূর্ণ পবিত্র স্বরূপের জ্যোতি সেইরূপ ক্রমে তাঁহার মনশ্চক্ষু সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মজ্ঞান আমাদিগের প্রাণে যে সাহস উৎপন্ন করে, সে সাহস আর অন্য কোথা হইতে আসিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মকার্য্য, ইহা সংসাধনে ঈশ্বর আমার সহায়, এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহা আমার অমৃত জীবন লাভের সোপান স্বরূপ হইবে, এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে জন্মে, তখন মানুষ অতুলনীয় সৎসাহসের পরিচয় দেয়। ধর্ম্মেতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহা সাহসের বীজ নিহিত।

অবরোধ প্রথার উৎপত্তি।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদই যে অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক, অনেক সত্যপ্রিয় ইতিহাসবেত্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহম্মদের সময় আরব দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল। মহম্মদের সহধর্ম্মিণীগণ একদা

অবাধ্যতা দোষে দোষী হওয়াতে মহম্মদ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এই আজ্ঞা দেন যে তাঁহারা বাটীর বাহিরে যাইতে পারিবেন না। মহম্মদ তাঁহার স্ত্রীগণের চরিত্র সম্বন্ধে অতি সন্দিগ্ধমনা ছিলেন। কথিত আছে যে জৈনাব নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর চপলতা জন্য তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং জৈনাব যাহাতে কোন পরপুরুষের নয়ন-গোচর না হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার দেশে পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। স্বীয় প্রথমা স্ত্রী আয়েসার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া মহম্মদ তাঁহাকেও পর্দ্দার অনুবর্ত্তিনী করেন। মহম্মদ এইরূপ নিয়ম করাতে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণও পর্দ্দার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ক্রমে যতই মহম্মদের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকদিগের পর্দ্দার মধ্যে বাসের প্রথা বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে —প্রত্যেক মুসলমান রমণী "পর্দ্দা-নসিনী—" হইলেন। যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। মুসলমান প্রথার অনুকরণে এবং যথেচ্ছাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

অজাগর সর্প।

অজাগর সর্প একটা কাল্পনিক পদার্থ এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। গল্পে অজাগর সর্পের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়া থাকে,তাহা অসম্ভব বলিয়া বাস্তব অজাগর সর্পের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অজাগর সর্প দুই জাতীয় ;—(১) বোয়া কনষ্ট্রিক্টর বা পাইথন, (২) ওফিওফেগস ইলাপস। বোয়া কনষ্ট্রিক্টর দশ বার হাত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা জড়বৎ পড়িয়া থাকে, নড়িতে চড়িতে বড়ই অনিচ্ছু। খাদ্যাহরণের সময় একটু চলিয়া বেড়ায়। ছাগল ভেড়া ইত্যাদি জন্তু ইহাদের প্রিয় আহার্য্য বস্তু। দক্ষিণ ভারতবর্ষের জঙ্গলে এই জাতীয় সর্প দৃষ্টিগোচর হয়। ওফিয়োফেগস্ ইলাপ্স জাতীয় অজাগর সর্প আমেরিকা খণ্ডে দৃষ্ট হয়,কিন্তু সম্প্রতি আসাম প্রদেশের অরণ্যে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় সর্প কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহা পাইথনের ন্যায় অলস নহে। ইহা গোক্ষুরার ন্যায় তেজীয়ান ও বিষধর। হরিণ, শৃগাল, ছাগল ইত্যাদি জন্তু দেখিলে ইহা দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মানুষকেও এই জাতীয় সর্প

আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং তাহার শরীর বেষ্টন করিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় সর্পের বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য সকল সর্প ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। গাঞ্জাম প্রদেশবাসী নীচশ্রেণীর লোকগণ এই সর্পকে পূজা করিয়া থাকে।

উৎকল রমণীর বেশভূষা।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ, বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে যাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। পুরাতত্ত্ববিৎ মহাশয় বঙ্গের গঙ্গা নদী, এবং গঙ্গাবংশ, এতদুভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উড়িষ্যার সর্ব্বাদিম কেশরী রাজগণ যে বঙ্গদেশস্থ তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে গিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কেশরী রাজগণের পরবর্ত্তী গঙ্গবংশীয়েরা দাক্ষিণাত্য হইতে আগত। গোদাবরীর আর একটী নাম গঙ্গা; অবশ্য এই নাম দাক্ষিণাত্যেই প্রচলিত। গোদাবরী তীরস্থ স্থান বিশেষ হইতে যে গঙ্গবংশীয় (এই বংশের অন্য নাম চোল) প্রথম রাজা চোল বা চোরগঙ্গ উৎকলে আসিয়া শেষ কেশরীরাজকে পরাভূত করিয়া উড়িষ্যায় রাজা হয়েন, একথা এখন বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। হণ্টর প্রভৃতি অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার মিত্রের বিরোধী মতই প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও উৎকলের অনেক সামাজিক রীতি নীতি, এবং বিশেষরূপে বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় অধিক ছিল। গঙ্গবংশীয় রাজগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির গঠন প্রণালী দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুরূপ; আর্য্যাবর্ত্তের—সঙ্গীত আদৌ প্রচলিত নাই, উড়িষ্যার সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে তৈলঙ্গী সঙ্গীতের অনুকরণে উৎপন্ন; এখনও "দক্ষিণীগান" উড়িষ্যায় সবিশেষ আদৃত। রাজা প্রতাপচন্দ্র দেব প্রণীত স্মৃতির গ্রন্থ উড়িষ্যায় অপ্রচলিত, কিন্তু তাহা দাক্ষিণাত্যের দায়ভাগ গ্রন্থ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। উৎকলে গোল গোল করিয়া অক্ষর লিখিবার রীতি তেলেগু লিপির অনুকরণে। ঋ এবং ৯ উড়িষ্যার "রু" এবং "লু" উচ্চারিত হয়; একটি "ল" উড়িষ্যা ভাষায় অধিক আছে, সেটির উচ্চারণ, ল এবং ড় এই দুইটির মধ্যবর্ত্তী বর্ণের এই সমুদায় উচ্চারণ দাক্ষিণাত্যেই আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি করণী অক্ষর তেলেগু অক্ষরের অনুরূপ। কেশরী

রাজগণের ভাষা বাঙ্গালা অথবা ঐরূপ একটী ভাষা ছিল ; দাক্ষিণাত্যের ভাষার প্রাদুর্ভাবে তাহাও স্থানে স্থানে (অথবা অল্প পরিমাণে) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা এসকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা গঙ্গবংশীয় রাজগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন। রাজাই দেশের প্রধান অনুকরণের স্থল। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের রীতি নীতি অল্প পরিমাণে দাক্ষিণাত্যের রীতি নীতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল প্রতিবেশী বলিয়া কেহ কখনও কাহাকেও অনুকরণ করে না। কারণ প্রতিদ্বন্দী বা সমকক্ষের নিকট স্বীয় প্রাধান্য কেহ বজায় রাখিতে ছাড়ে না। এবিষয়ে যাঁহারা দৃঢ় প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা হণ্টর সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারেন।

বেশভূষা সম্বন্ধেও সেই কথা। উড়িষ্যায় দক্ষিণ প্রদেশীয় বেশভূষাই আদর্শস্থানীয়। প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের গ্রন্থে এবং আধুনিক উৎকল রমণীর শরীরে যে সকল অলঙ্কারের নামোল্লেখ ও দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও প্রচলিত নাই। মাথার চাঁদ হইতে পায়ের ঝুণ্টিয়া পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের চক্ষে নূতন। বঙ্গরমণীর মাথার খোঁপা, সহরেই অনেকটা অনুকারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সর্ব্বত্রই শিরে "তৈলঙ্গীজোড়া"। জোড়া অর্থ উড়িয়ার খোঁপা। উড়িষ্যার গৌরবস্থল সুকবি বাবু রাধানাথ রায় তাঁহার সুপাঠ্য এবং সুমিষ্ট "চন্দ্রভাগা" গ্রন্থে যেখানেই কোন রমণীর সুন্দর বেশভূষার বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই দক্ষিণের আদর্শ ধরিয়াছেন। একস্থলে আছে, 'প্রভা মণ্ডলরে (মণ্ডলে) মণ্ডিত তনু কণক গোরা ; তৈলাঙ্গী বর্শন ভূষণে পুণি (আরও) দিশই (দেখায়) তোরা (উজ্জ্বল)।' অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া রাখি। বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় বঙ্গভাষাতেও অনেক সুপদ্য লিখিয়াছেন। ইঁহার উৎকল কবিতা বঙ্গের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

অলঙ্কারের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বর্ণনা করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ শিরোভূষণ। মস্তকের উপর একটা ন্যূনকল্পে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত উচ্চ খোঁপা (জোড়া)। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, এদেশের সকল রমণীরই খুব দীর্ঘ কেশ। মহানদীর জলের সে গুণ থাকিলে কুন্তলবৃষ্যের পরিবর্ত্তে বোতল বোতল ঐ জলই বিক্রীত হইত। যাহার চুল নাই, সেও ফিতা এবং নেকড়া জড়াইয়া কোন মতে একটি উঁচু খোঁপা বাঁধে। খোঁপার উচ্চভাগ জুড়িয়া একখানা গোলাকার সোণার চাকতি থাকে। (বলা বাহুল্য আমি ধনীর গৃহের রমণীদিগের কথাই লিখিতেছি)। চাকতি খানার পাশ জুড়িয়া আর একখানি

অর্দ্ধচন্দ্র। তদুপরি যদি দু চারিটি কণ্টকের প্রসিদ্ধ "ফুল" গোঁজা যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। এইত গেল মাথায় খোঁপা। তার পর আবার চুলগুলি যাহাতে উড়িতে বা ঈষৎ স্থানচ্যুত হইতে না পারে, তাহার জন্ত মোম দিয়া চুলগুলি আঁটিয়া রাখা হয় এবং সিঁথির মূলদেশ হইতে প্রায় খোঁপার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সিঁদুর লেপিয়া দেওয়া হয়। সিঁথিতে এবং খোঁপার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অলঙ্কার শোভা পায়, দুই একখানি হইলে তাহার নাম করিয়া শেষ করিতাম। নাসিকা অলঙ্কার ভারে এতদূর পীড়িত, যে সালঙ্কৃতা রমণীর নাক আছে কি না, অনেক কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। তাটঙ্ক প্রভৃতি কর্ণভূষণ আয়তনে এবং পরিমাণে নাসালঙ্কারের সমতুল্য বা অধিক। মণিবন্ধে এবং প্রকোষ্ঠে অন্যূন দশ রকমের অলঙ্কার; তন্মধ্যে কতুরই প্রভৃতি দুই একখানি অলঙ্কারের বহির্ব্যাস পরিমাণ হস্তের স্থূলতার দ্বিগুণের কম নহে। সেগুলি আবার ধারে এবং ভারে অনায়াসে অনেক সময়ে অস্ত্রের কার্য্য করিতে পারে। যদি কোন সালঙ্কারা রমণী ক্রোধে কাহারও উদ্দেশে বাহু নাড়া দেন, তবে খুব বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি নির্ব্বিরোধী ভারতবাসীর উপর অস্ত্র আইন জারি করিতে পারেন, তবে উৎকলের ভীতপুরুষ অবলার উপর গহনার আইন জারি করিলে কিছু কাপুরুষতা হইবে মনে করি না। বঙ্গরমণীর চরণালঙ্কার শোভার জন্য এবং ঝুম ঝুম করিয়া শব্দ করিবার জন্য। কিন্তু উৎকল রমণী যে প্রকারে মল পরিধান করেন, তাহাতে মনে হয় যে মল কোন প্রকারে খসিয়া না পড়ে অথবা চোরে খুলিয়া না লইতে পারে, এই দিকেই তাঁহারা অধিক সতর্ক। তবে উৎকল-চক্ষে তাহা শোভাশূন্য, এ কথা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না। ঝুম ঝুম শব্দ না হউক, ঠুং ঠুং শব্দের ব্যবস্থা আছে; পায়ের আঙ্গুলে যে ঝুঁণ্টিয়া থাকে, চলিবার সময় সে কখনো নীরব থাকে না। যাহারা নির্ধন, তাহারা এত স্বর্ণালঙ্কার বা রৌপ্যালঙ্কার কোথায় পাইবে? কিন্তু তাহারাও পিত্তল এবং কাঁসার আশীর্ব্বাদে অলঙ্কারের পরিমাণ সমান রাখিতে ত্রুটী করে না। আমি কখনো সমগ্র উড়িষ্যা দেশের মধ্যে অলঙ্কারভার-পীড়িতা নহেন, এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই। অলঙ্কারের আর অধিক বর্ণনা করিব না। কি জানি, যদি এ মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া কেহ আবার, শ্রীকৃষ্ণ দাসের দোকান ছাড়িয়া উড়িয়া সেক্‌রা, কাঁসারী এবং কামারদিগকে (সকলেই অলঙ্কার গড়ে) অর্ডার পাঠান।

অঙ্গরাগ এবং পরিধেয় বসনের কথা বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই। উড়িষ্যা জগন্নাথ ক্ষেত্র; কিন্তু হরিদ্রা ক্ষেত্রও বটে। বিলাত-প্রত্যাগত একজন কৃষি-

বিদ্যা পারদর্শী পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, উড়িষ্যার ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হরিদ্রাক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার জন্য অথবা উড়িষ্যায় রং ফলাইবার জন্য উড়িষ্যার কন্দজাতি নরহত্যা করিয়া জমিতে রক্ত সিঞ্চন করিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রমণীর অঙ্গরাগ সেই হরিদ্রা। স্নানাদি শেষ করিয়া, অথবা অপরাহ্নে বেশ ভূষা করিবার সময় রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে হলুদ্ মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মেথি, আমলকী প্রভৃতির মিশ্রণে এক প্রকার মস্‌লা প্রস্তুত হয়, সেইগুলি জলে গুলিয়া মাথার চুলে দিবারও পদ্ধতি আছে।

উড়িষ্যার স্ত্রীলোকদিগের কাপড় দীর্ঘে ১৫।১৬ হাত; কিন্তু সেই কাপড় এমন জড়াইয়া জড়াইয়া পরিবার রীতি যে অবশেষে গাত্রাবরণের জন্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। কাপড় যত বড়ই হউক না কেন, পরিবার সময় এমন গুটাইয়া পরা হয়, যে রাজবধূ হইতে ভিখারিণী পর্য্যন্ত কাহারও কাপড় হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত পড়ে না। সহরে যে সকল মেয়েরা বাঙ্গালী মেয়েদিগের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর মত কাপড় পরিয়া আসিয়া থাকেন; কিন্তু ঘরে গিয়া আবার দেশীয় ধরণে কাপড় পরেন। এদেশের সকল শ্রেণীর এবং সকল জাতির স্ত্রীলোকেরাই এক একখানি কৌপীন পরিধান করিয়া পরে সাড়ী পরিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও কাছা আঁটিয়া কাপড় পরিবারও রীতি আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

জীবনের এক প্রধান লক্ষণ শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ। কি স্থলচর, কি জলচর সকল জীবের ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিতেও ঐ ক্রিয়ার অভাব নাই অর্থাৎ বৃক্ষেরাও শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। শ্বাস গ্রহণ না করিলে কোন পদার্থ জীবিত থাকিতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অপর নাম "প্রাণন"। যাহারা প্রাণন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহারা প্রাণী পদবাচ্য। এই লক্ষণানুসারে বৃক্ষাদিও প্রাণী হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস অস্মদাদির দুর্লক্ষ্য; সে কারণে পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থকে প্রাণী সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। ফল, তাহারাও শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট জীবিত পদার্থ।

শ্বাস গ্রহণের উদ্দেশ্য বা প্রধান কার্য্য —তদ্দ্বারা গৃহীত বাহ্য বায়ু দেহস্থ শোণিত পরিশুদ্ধ করিবে। শোণিতের শুদ্ধি কার্য্যের জন্যই ঐ শ্বাস ক্রিয়া বা প্রাণন বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২০ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯৮—সেপ্টেম্বর ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

কালচক্র ঘুরে অবিরত,
সুখ দুঃখ চলে সাথে সাথ;
জীবনের ভোগ সেইমত,
কভু হাসি, কভু অশ্রুপাত।

আজিকার জনম উৎসবে,
স্তরে স্তরে পুড়িছে হৃদয়;
পূর্ণদিক্ হাহাকার রবে,
বলি তবু জগদীশ জয়!

তব ইচ্ছা হউক পূরণ,
সুখ দুঃখ যা কর বিধান;
তব কার্য্য করিব সাধন,
সঁপি তব পদে মনঃপ্রাণ।

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় আজি বামাবোধিনী ২৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া ২৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ভক্তিভরে সেই দেবতার চরণে প্রণত হইয়া এবং ইহার আত্মীয় পরিজন স্বদেশীয় বিদেশীয় হিতৈষী ভাই ভগিনী সকলের শুভাশীষ যাচ্ঞা করিয়া ইহা নববর্ষের কার্য্যে প্রবেশ করিতেছে।

বামাবোধিনী এবার শ্রাবণের ধারার সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়াছে। এমত দুর্ব্বৎসর এতৎ-কালে ইহার হয় নাই। বঙ্গের পরমবন্ধু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিয়োগে বাঙ্গালীজাতি বন্ধুহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গনারীগণ পিতৃহীন

হইয়াছে বলিয়া বামাবোধিনী তাহাদের সহিত অপার শোকসাগরে ভাসিতেছে! বামাবোধিনীর পরম হিতৈষী কোন্নগর নিবাসী সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোকগমনে বামাবোধিনী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বামাবোধিনী আরও দুইটী দারুণ শোকশেলে বিদ্ধ হইয়াছেন! থাঁটুরা নিবাসী বাবু বসন্তকুমার দত্ত বামাবোধিনীর অসহায় বাল্যজীবনে ইহার প্রতিপালকের স্থান গ্রহণ করিয়া বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ইহার জীবন রক্ষণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, বামাবোধিনী তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। গতবর্ষে সেই বন্ধুবরকে হারাইয়া বামাবোধিনী গভীর শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটী ভক্তিভাজন প্রাচীনবন্ধু যিনি বামাবোধিনীকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফল পৃথিবীর নানাস্থানের নানাজাতীয় মনুষ্যের বৃত্তান্ত লিখিয়া বামাবোধিনীর স্তম্ভসকলকে সুশোভিত করিয়াছিলেন, আজি কয়েক দিন হইল তিনিও ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন—তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কুলোদ্ভব দেবর্ষি স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র। এই সকল অন্তরঙ্গ আত্মীয় জনের বিয়োগে বামাবোধিনী শোকে জর জর হইয়াছেন, এ শোক বর্ণনীয় নয়। বামাবোধিনী যোড় করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি দুঃখিনী বঙ্গনারীগণের পরম বন্ধু এই মহাত্মাদিগের আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন। বামাবোধিনী যেন তাঁহাদের উপকার ঋণ শ্রদ্ধার সহিত চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন এবং তাঁহাদের ন্যায় বামাকুল হিতৈষী সকলের উদয়ে বঙ্গমাতার শূন্য বক্ষ যেন আবার পূর্ণ দেখিতে পান।

বামাবোধিনী আজি তাহার জন্মোৎসবের দিনে শোক বিহ্বল হইয়া আত্মকথা আর কি নিবেদন করিবে? বামাবোধিনী ইহার পাঠক পাঠিকা ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট কাতর প্রাণে সহৃদয়তা ভিক্ষা করিতেছে। ভারতবাসিনী দুর্ভাগিনী রমণীগণের প্রতি মুখ তুলিয়া চায়, এমত লোক অতি অল্প। ইহাদিগের হইয়া দুকথা যাহারা বলিতে যায়, তাহারাও লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। বামাবোধিনী অবলাগণের দুঃখে দুঃখিনী ও দূষিত দেশাচারের পরিবর্ত্তে সমাজ মধ্যে সদাচার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতিনী এই জন্য কয়েকটী গ্রাহক ইহার সহিত সম্বন্ধপরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বামাবোধিনীকে ইংরাজী সভ্যতার পক্ষপাতী ও দেশীয় রীতিপদ্ধতির উপেক্ষাকারী বলিয়া ইহার প্রতি তীব্রগালি বর্ষণ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বামাবোধিনীর প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা ইহার সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত, তাঁহারা

বিলক্ষণ জানেন; সে বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য বলিয়া আমরা অধিক কিছু বলিব না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য, বামাবোধিনী এ দেশের নারীজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর জ্ঞান শক্তি অনুসারে সেই ব্রতপালনে নিযুক্ত আছেন ও থাকিবেন। ঈশ্বর করুন্ অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থার মধ্যে নিন্দা প্রশংসা লাভালাভ সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া বামাবোধিনী যেন অবিচলিত ভাবে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। আজি বামাবোধিনীর বন্ধুগণ সকলে ইহাঁকে সেই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের মহাশোক—বঙ্গের মহোজ্জ্বল রত্ন কয়েকটী গত শ্রাবণের জলস্রোতে কাল-সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের বিয়োগে বঙ্গমাতা যে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন তাহা পূরণ হইবার নয়। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু কালী কৃষ্ণ মিত্রের শোকে দেশময় হাহাকার পড়িয়াছে। ইহাদিগের স্মরণার্থে সংবাদ পত্রে বিলাপ প্রকাশ এবং নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে। কালী কৃষ্ণ বাবু অতি নির্জনপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কারের মূলে তিনি ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার স্মরণ সভা হইয়া স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ না হইতেছে। রাজা রাজেন্দ্র লালেরও স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তুত হইতেছে। কবে আমরা ইহাদিগের ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আবার পাইব?

চিনে শিশু হত্যা—চিন মহারাজ্যের মধ্যে বৎসরে ২ লক্ষ করিয়া সদ্যোজাত কন্যা হত হইয়া থাকে, এ সংবাদে কাহার না হৃৎকম্প হয়? দেশের নানা স্থানে ১০ হইতে ৩০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এক একটী গৃহ নির্ম্মিত আছে, তাহার কেবল একটী দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সন্তান গৃহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কলিচূণ ঢালিয়া ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ বিনাশ করা হইয়া থাকে। মফস্বল প্রদেশের গরিব দুঃখী লোকেরা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অধিক পরিমাণে এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া থাকে। হাঙ্কো নগরে এক রোমান-কাথলিক শিশু-আশ্রম হইয়াছে, মাদার পলা বিসমারা তাহার তত্ত্বাবধায়িকা। নদীর ধার ও অন্যান্য স্থান হইতে কুড়াইয়া ইহারা প্রায় ৪০ হাজার শিশুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দেশের আইন ও মাতা পিতার হস্ত

যেখানে কন্যা বধের সহায়তা করে, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন সেখানে শিশুদিগের প্রাণ কে রক্ষা করিবে?

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আপনার স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ২০০০ টাকা ব্যয়ে বৈদ্যনাথে একটী বাটী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কুষ্ঠ রোগীদিগের নিরাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি সেই টাকা কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণার্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্প্রতি সেবাগুণে তাঁহাকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নামে এই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ডাক্তার মহাশয়ের ইচ্ছা।

মণিপুর কাণ্ডের পরিণাম—যুবরাজ টেকেন্দ্রজিৎ ও সেনাধ্যক্ষ টাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। কুলচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সম্ভাবনা। মণিপুর ইংরাজাশ্রিত একটী রাজ্য হইবে এবং রাজবংশের কোন ব্যক্তি রাজা মনোনীত হইবে।

স্মরণার্থ দান—জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ ঢাকা কলেজে ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন, তাহার সুদে একটী ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—রাউমেনিয়ার প্রথম স্ত্রী বারিষ্টার শার্ম্মিয়া বিলসেস্কো বুচারেষ্ট নগরে ব্যবসায় খুলিতে যাইতেছেন। তিনি গত শীতকালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনেক বাদানুবাদের পর রাউমেনীর রাজসভা স্ত্রীলোককে বারিষ্টারী করিবার অধিকার দিয়াছেন।

সিজারউইচের স্বদেশ প্রত্যাগমন—গত ১৬ই আগষ্ট রুসীয় যুবরাজ মস্কো নগরে নিরাপদে প্রত্যাগমন করাতে নগরবাসীরা মহানন্দ প্রকাশ ও গিরজায় গিরজায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ উপাসনা করিয়াছে।

ছোটলাটের সহৃদয়তা—গত ১১ই আগষ্ট সার চার্লস ইলিয়ট ময়মনসিংহের জলের কল এবং ১৫ই আগষ্ট বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বরিশালস্থ মহিলাগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকাবিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের অধীন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

যুবরাজপত্নীর শিল্পদক্ষতা—ভিয়েনাতে যে অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইবে, আমাদিগের বড় রাজবধূ তাহাতে স্বহস্ত প্রস্তুত অনেকগুলি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ লাইব্রেরি ভবনে গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। এক পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। উপরে যে ছবি দেওয়া হইল ইহা তাঁহার যুবা বয়সের ছবি।

আমাদিগের কোন সহৃদয়া লেখিকা ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র দেহের দাহকার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

আজি বেলা ৭টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয়—বিদারক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম মানব-জগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অহঙ্কার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চ গৌরব ফুরাইয়াছে! দেখিলাম সেই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এজনমের মত আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন! আজি আর কাঙ্গালের দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই,

হতভাগ্যের অশ্রু মুছিবার স্থান নাই, দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার উপায় নাই! আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন! আজি বাঙ্গালার সাধ বাসনা ফুরাইল, বাঙ্গালির জাতি-গৌরব ফুরাইল, বুঝি ব্রাহ্মণ বংশের সৌভাগ্য-গর্ব্বও ফুরাইয়া আসিল —আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন! আজি বঙ্গজননী নয়নের মণি, আঁচলের নিধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন! আজি আমরা সকলেই পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্তান সন্ততিগণের সহিত আজি আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও নিজের সম্পত্তি নহে; জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের মত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সকলের জিনিস। যে মূর্খ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে দরিদ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে রমণী সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে বালিকা বৈধব্য আগুনে পুড়িতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা অন্ন বস্ত্রের জন্তে লালায়িতা, শিশু সন্তান পালনে অক্ষমা, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এক কথায় বলিতে গেলে যাহার হৃদয়ে একটুকু ব্যথা আছে, যাহার একটুকু অভাব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এই হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আমার" বলিতে পারি। তাই, সকলের জিনিস বলিয়া—সকলের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমরা সকলেই আজি পিতৃহীন, বন্ধুহীন ও আরামের স্থান হীন হইয়াছি! আজি পৃথিবী! শোন, আকাশ শোন, মানুষ শোন, দেবতা শোন, সকলেই আজি এই শোকসন্তপ্ত প্রাণের কাতরোচ্ছ্বাস শোন, সকলেই আজি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শোন, আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়াছেন!! এই কয়টী কথার মধ্যে আমাদের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ভরা রহিয়াছে, কি অসহ শোক তাপ ঢালা রহিয়াছে, যাহার হৃদয় আছে তিনি তাহা হৃদয়ে অনুভব করুন্। এ নিদারুণ কথা, এ হৃদয়ময় বেদনা কহিতে পারি এমন ভাষা আজিও হয় নাই।—যদি হইয়া থাকে আমরা শিখিতে পারি নাই।

ওই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, বাঙ্গালির "পিরামিড" ভষ্মসাৎ হইতেছে! ওই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, অই আগুনে বাঙ্গালার সম্মান গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে! ওই জলন্ত আগুনে বাঙ্গালির প্রধান অহঙ্কার প্রধান গর্ব্ব পুড়িয়া যাইতেছে! ওই চিতার আগুনে আজি কত কি ফুরাইল! সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হইল! কত কাঙ্গাল গরিব একত্রে মাতা পিতা হারা হইল! কত

হৃদয় আজি আশা ভরসা হারা হইল! শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, আজি চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, ইহার মত সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে, তাহা আমরা জানি না! যে দেহ পরের জন্যে, জগতের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, অবিশ্রান্ত ভাবে অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ—আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময় দেব-দেহ চিতার ভস্ম হইতেছে! এই ভস্ম হৃদয়ে লইয়া মা' জাহ্নবীও অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিতেছেন! আর আত্মা? সে অক্ষয় অমরাত্মা স্বর্গে গিয়াছে। যেখানে মহর্ষি ব্যাস, পরাশর, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি দেবতাগণ বিরাজিত আছেন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইখানে গিয়াছেন। বিশ্বজননীর স্নেহময় কোলে আমাদের সেই পরিশ্রান্ত দেবতা ঘুমাইতে গিয়াছেন। আজি ঈশ্বরে "ঈশ্বর" বিলীন হইয়াছে! একবার প্রাণ ভরিয়া সকলে হরি হরি বল! নরনারী, ইংরাজ বাঙ্গালি, বড় ছোট, চেতন অচেতন, জগৎ স্বর্গ, সকলে একত্রে প্রাণ খুলিয়া, গলায় গলা মিশাইয়া হরি হরি বল। আমাদের পিতা, শিক্ষক, বন্ধু, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আজি অনন্ত সাগরে মিলিত হইতেছেন, আজ একবার মনের মত করিয়া হরি হরি বলি! আমরা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সহস্র ঋণী—যে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগখানিও পড়িতেছে, সেও বিদ্যাসাগরের নিকটে বিক্রীত—তাঁহারই হাতে গড়া পুতুল, এস সকলে একবার হরি হরি বলি!!

এ চিতার আগুন নিভিবে ও দেহের শেষ চিহ্ন ফুরাইবে; কিন্তু বিধবা রমণীর বুকের আগুনের মত ভারতের বুকের স্তরে স্তরে এই শোকের আগুন জ্বলিতে থাকিবে। আজি যে ময়ূরাসন, যে রাজাসন শূন্য হইল, সেখানে বসিবার রাজা—মহারাজা—সম্রাট্ বুঝি আর মিলিবে না! এ অমূল্য রত্ন এ দেবদুর্লভ রত্ন হারাইয়া ভারতের—জগতের বলিলেও ক্ষতি হয় না,—যে নিদারুণ অভাব হইল, বুঝি সহস্র বৎসরেও সে অভাব পূর্ণ হইবে না! বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতবাসী বলিয়া ভারতবর্ষ ধন্য, বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি জাতি ধন্য, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া ব্রাহ্মণ কুল ধন্য "আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়" বলিয়া মানবসমাজে দাঁড়াইতে পারি, এজন্য আমাদের এ অপদার্থ জীবনও বুঝি ধন্য—সেই ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসনে বসিবার মত দেবতা কোথায়?

তবে যাও, বঙ্গবাসী, হরি হরি বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিয়া যাও। বাঙ্গালা দেশের, ভারতবর্ষের, জগৎ

সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন কলিকাতার নিমতলার ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়া হরি হরি বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি মা'র বুকে অঙ্কিত কর। সকলের উপরে—যার ক্ষমতা থাকে, হরি হরি বলিয়া আত্মগঠন কর, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর! মানবজীবন সফল কর। মানবত্ব, দেবত্বে মিশ্রিত কর!

তা এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কি মরিবার ছেলে? যিনি কোটী কোটী মৃত্যু পদ-দলিত করিয়া চলেন, তাঁহার কি মৃত্যু হইতে পারে? না, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মরিতে জানেন না। অনেক রকম জানেন—মানুষ কেমন করিয়া দেবতা হয় তাহা জানেন, স্বাবলম্বনের বলে গরিবের ছেলে কেমন করিয়া রাজাধিরাজ হইতে পারে তাহা জানেন, মরজগৎকে কেমন করিয়া স্বর্গ করিতে হয় তাহা জানেন, জগতের প্রত্যেক নরনারীকে কেমন করিয়া "আপনার জন" করিতে হয় তাহা জানেন, পরের ভিতরে নিজের অস্তিত্ব কেমন করিয়া মিশাইতে হয় তাহা জানেন, এই বিশ্ব জগৎ কি করিয়া এক বাঁধনে বাঁধিতে হয় তাহা জানেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দেবতা হইতে হইলে যাহা কিছু জানিতে হয় সবই জানেন, কেবল মরিতে জানেন না, দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়।

কে বলিল আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই! পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায় যাউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় না থাকিলে আমাদের আর থাকিল কি? আজিতো কলিকাতা সহরের সকল স্থানেই বিদ্যাসাগর মহাশয় রহিয়াছেন। আজি তো কলিকাতার প্রতি শিরা ধমনীতে, প্রতি অণু পরমাণুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্রোত ছুটিতেছে। আজি তো কলিকাতা মহানগরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকে যত বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্ত্তি ধরিয়া ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতেছেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের ব্যথা হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন! তাই বলিতেছি, রামা মরিতে জানে, শঙ্করা মরিতে জানে, তাহাদের মত শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও দিন মরিতে জানেন না। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা, সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ণ আদর্শ, জগতের

দেবদুর্লভ রত্ন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি চিরদিন সমভাবে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই খাটিয়াছেন, যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা, পৈশাচিক কৃতঘ্নতা, অনায়াসে পদ-দলিত করিয়াছেন, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া কখনও যাইতে পারেন না!! আজি মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অমর হইয়াছে। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আমাদের নিকটে বিরাজ করিতেছেন। তবে আর কি, "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

শ্রীমা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা।

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় বেথুন কলেজ গৃহে পরলোকগত পূজ্যপাদ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে মহিলাগণের একটি সমিতি আহূত হয়। উহাতে প্রায় তিন শত রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। যদিও এই সভাটি ব্রাহ্মমহিলাদিগের উদ্যোগ ও যত্নে সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক হিন্দুমহিলা আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কতিপয় খৃষ্টীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কুমারী কামিনী সেন সভাপতি মনোনীত হন এবং তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন:—

আমাদের দেশের গৌরব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে আমাদের দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার গুণের কথা আমাদের দেশে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন, উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে অনেকে হয় ত সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র, অলোকসামান্য মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার নির্ভীকতা—আর কত গুণের কথা বলিব? একাধারে এত গুণের সমবায় বর্ত্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ এক প্রকারে নয়—বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত। সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদা-

চারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারত রমণীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্ব্ব-প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান্ সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। চিরদিন অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আজি কিয়ৎ পরিমাণে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরকে সভাস্থ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলিলে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগির বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠানন্তর এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন :—

১ম প্রস্তাব। অদ্যকার সভাতে সমাগত মহিলাগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনে আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু অচিরে আর মিলিবে না। তিনি এদেশের নারীগণের দুর্দ্দশা বিমোচনার্থ শরীর মনের শক্তি, অর্থ ও সময় কিছুই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সেই উদার প্রীতি ও অকৃত্রিম নারীহিতৈষিতা স্মরণ করিয়া সকলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শ্রীমতী অবলা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। শ্রীমতী কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাদিগের গভীর পিতৃশোকের সহিত এই সভাতে সমবেত মহিলাদিগের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দে প্রস্তাব করেন যে, বেথুন কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, শ্রীমতী বরদা সুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু এবং শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন ইঁহাদের কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া ইঁহাদের প্রতি চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হউক। শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষকে সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্তা কুচবিহারের মহারাণীকে সভাপতি করা হউক।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বেথুন কলেজেই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সর্ব্বো-

পযুক্ত স্থান, সে সম্বন্ধে বিশদরূপে আপনার সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন, বঙ্গরমণীগণ কোথাও যদি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বাসনা করেন, তবে সে এই স্থান। যে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের বিংশতি বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বেথুনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে বেথুনের এই সুন্দর চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে পরলোকগত মহাত্মার এক খানি ছবি সন্নিবেশিত হউক। অথবা মহাত্মা বেথুনের প্রস্তর মূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হউক। যে প্রকার স্মৃতিচিহ্নই হউক না কেন, আমার একান্ত ইচ্ছা তাহা এই বেথুন কলেজেই যেন সংস্থাপিত হয়।

অতঃপর কেহ কেহ বলেন যে চিত্র অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে এত অর্থ আমাদের মধ্যে সংগৃহীত হইবে না, অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এই স্কুলে একটি বৃত্তি স্থাপিত হউক।

তৎপরে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রেরিত প্রস্তাবটি পঠিত হয়—প্রস্তাবটি এই—

"তাঁহার নামে অসহায়, অক্ষম, অবলাদিগের জন্য একটি আবাস স্থান স্থাপিত হউক।"

এই প্রস্তাবে কোন কোন হিন্দুরমণী অসম্মতি প্রকাশ করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রস্তাব করেন যে প্রতি বৎসরে তাঁহার মৃত্যু দিবসে তাঁহার স্মরণার্থে সভা আহূত হউক, তাঁহার সুন্দর কার্য্যাবলী তথায় আলোচিত হইবে। শ্রীমতী অচলবালা বসু এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর দুই চারি জন মহিলা সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহাদের গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থে হিন্দু অন্তঃপুরে চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভাস্থলে কতক চাঁদা সংগৃহীত এবং শতাধিক মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন এই বলিয়া উপসংহার করিলেনঃ—

আপনারা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের অনেক কথা জানেন। এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীও পঠিত হইল। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। তবে জ্ঞাত এবং পঠিত বিষয়ের মধ্যে দুই একটির প্রতি আমি বিশেষ ভাবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আজ কাল এদেশে অনেক সংস্কারক